আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টাবিংশ গ্রন্থ

নব-বর্ষের স্বপ্ন

শ্রীসরলা দেবী

শ্রাবণ,—১৩২৫

প্রকাশক।—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
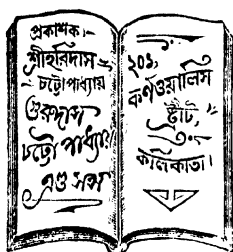
নব-বর্ষের স্বপ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজকালকার কালেজের নব্য বাঙ্গালী আমি। আর্য্যামিবর্জ্জিত নহি, অথচ ব্যবহারে অনেকগুলি অনার্য্য ভাব। বাল্যবিবাহ ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে কোন "থিওরি" নাই, "প্রাকৃটিসে" এই ঘটিয়াছে যে, বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণের উদ্যোগে ভগিনীর বিবাহ খুব সকাল সকাল সমাধা হইয়াছে—তাহাতে আমি কোন বাধা দিই নাই; কিন্তু নিজেকে এ পর্য্যন্ত বহুযত্নে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হইতে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, এটি আমার কালেজী অনার্য্য শিক্ষার ফল হইবে বোধ হয়। আমার বন্ধুবর্গের

মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহাদের প্রণয়িনীর অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বিবাহিত জীবনের সুখই শ্রেষ্ঠ সুখ, উদাহরণস্বরূপ তাঁহার নিজের দাম্পত্য-জীবনের কতকগুলি চিত্র উজ্জ্বল-বর্ণে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্য সহকারে তাঁহার বিশ্রম্ভালাপে মনোনিবেশ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহার পন্থানুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এমনও দেখিয়াছি, কোন কোন সুহৃদ্বর চাঁদের আলোতে অদৃষ্টপূর্ব্বা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে কবিতা আওড়াইয়া হা-হুতাশ করিয়া শেলি-বাইরণের অন্ন মারার উপক্রম করিতেছেন—তাঁহাদের দলে ভিড়িতেও কখন সাধ যায় নাই। কবিতা পড়িয়াছি ঢের, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জীবনে কাব্যরসের চর্চ্চাটা আমার দ্বারা হইয়া উঠিল না। আমার কোন সুরসিকা আত্মীয়া একদিন প্রেম ও প্রেমিকাখ্য মূর্খাগ্রগণ্য সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বল রসিকতার প্রয়াসে হাড়ে চটিয়া উঠিয়া প্রতিশোধস্পৃহা-দীপ্ত ডাগর

উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বলতর করিয়া বলিলেন, "হে বিদ্রূপ-বাগীশ! দর্পহারী কন্দর্প আছেন, তোমার ঐ বিদ্রূপের শোধ একদিন তুলিবেন; এখন তুমি নিরাময় রহিয়াছ; কিন্তু তোমার পাকা হাড়ে যখন রোগ ধরিবে, তখন আর কিছুতেই সে বিষ ঝাড়িতে পারিবে না। মা দুর্গা করুন, আমি যেন সে দিন দেখিয়া মরিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "তা হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কবি ভবভূতি বলেছে,—

'ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনং
ললিতমধুরাস্তে তে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাম্।'

মায়াকুমারীরাও গেয়েছে—

'গরব সব হায়, কখন টুটে যায়
সলিল বহে যায়—নয়নে'

তা আমার কপালেও একদিন নাকের জলে চোখের জলে চোবানি আছে বোধ হয়! মনসিজ হে! কেউ বাদ যাবে না—শর্ম্মা ছাড়া।"

নব-বর্ষের স্বপ্ন

আশা করিয়াছিলাম, এমন সবিনয় সম্মতি-বাক্যে ঠাকুরাণীর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি অনেকটা শীতল হইয়া আসিবে, কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না; তিনি শুধু একটি ভাবব্যঞ্জক গ্রীবাভঙ্গী করিয়া ঈষৎ চাপা হাসির স্বরে বলিলেন, "যাও যাও, আর চালাকী কর্ত্তে হবে না।"

আমার ন্যায় অপ্রেমিকেরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কারণ, সেই নাস্তিক আমি কিছু দিন পরেই স্বচ্ছন্দে অপ্রেমগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া একটা কাঁচা রোম্যাণ্টিক ষোড়শবর্ষীয় বালকের ন্যায় নব-বর্ষের প্রভাতে স্বপ্ন দেখিলাম, আমার একটি প্রণয়িনী; উভয়ের মন জানিয়া উভয়ের বিস্মিত সলাজ ভাব, মৌনভাবে পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্ত আনন্দের সঞ্চার। অনুভবে বুঝিলাম, প্রেমে পড়া জিনিষটা ভারি সহজ, সরল, অবাধ; এবং একটি বহু পুরাতন সত্য আজ সহসা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম,—

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেটি এই যে, ব্যক্ত প্রেমের প্রথম মুহূর্ত্ত নিরতিশয় মধুর,—মনোরাজ্যে আমার এই আবিষ্কার জড়রাজ্যে কলম্বসের আবিষ্কারের অপেক্ষাও গুরুতর।

বিছানা হইতে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ। দেখিলাম, পুষ্করিণীর ঘাটে একজন যুবক দ্বারবান্ স্নানান্তে সিক্ত-বসনে গায়ত্রী পাঠ করিতেছে। পূর্ব্বেও তাহার গায়ত্রী-পাঠ শুনিয়াছি; কিন্তু আর কখন তাহা এমন ভাবে মন স্পর্শ করে নাই। আজ নব-বর্ষের প্রভাতে তাহার বন্দনা-গানে মন প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। একবার আকাশে চাহিয়া দেখিলাম—আমরা ধরায় যে মানবীকে ভালবাসি, তাহাতেই ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাই আমার আকাশের দেবতা ও সবে মাত্র স্বপ্নানুভূতা হৃদয়ের দেবীকে এক মনে হইল; উভয়ের সমান প্রসন্ন প্রশান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। বেড়াইতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ বেড়াইতে বেড়াইতে, বাগানের প্রান্তে উদ্যান-পালকের

কুটীরের নিকট আসিয়া পড়িলাম। তাহার সন্তানহীনা পত্নী গৃহপোষ্য জীবের উপর দিয়া তাহার ক্ষুধিত মাতৃ-স্নেহের চর্চ্চা করে। কুটীরের নিকটস্থ হইবামাত্র দুইটি কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; একটি বিড়াল বহুকষ্টে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া, আমার গায়ে দুই একবার মাথা ঘষিল; আমার আর দুইটি বন্ধু—দুটি অনুদ্ভিন্ন-শৃঙ্গ গোবৎস তাহাদের অনতিদীর্ঘ দড়ির বন্ধন ছিঁড়িয়া আমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিলেন। আমি পার্শ্বস্থ ডুমুর-বৃক্ষের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের দিলাম; অদূরে দুই ক্রীড়াশীল ছাগশিশু তাহাদের মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কচি কচি দাঁত দিয়া সেই ডালের উপর দুই একবার আক্রমণ করিল।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, উদ্যান-পালিকা ভগবতী-পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত, কেবল পুরোহিত আসিলেই হয়। কুটীরের ভিতর

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার অনেকগুলি অপোগণ্ড বালককে সমবেত দেখিলাম। স্মরণ হইল, আজ নূতন বর্ষারম্ভে মালী-বধূর নূতন পাত্রে পায়সান্ন রাঁধিবার কথা; বুঝিলাম, তাই এতগুলি অনাহূত অতিথি-সমাগম। আজ প্রত্যূষে তাহার গৃহে দাদাবাবুর পদধূলিলাভে মালী-বধূর আনন্দাতিশয্য ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, এবং উক্ত দাদাবাবুর অপ্রতিভ ভাবের কথা বলাই বাহুল্য। আজ পৃথিবী বেশ। এই উদারহৃদয়া উদ্যান-পালিকা, এই স্নেহশীল পশুগণ, সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকা, আর এই অসীম আকাশব্যাপী দেবতা সকলেই আজ আমার নিতান্ত আপনার।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় ব্যজন করিতে করিতে ভগিনী বলিল, "দাদা, বিয়ে কর না ভাই, এমন ফাঁকা ঘর-দুয়োর, ঘরে বৌ নেই, কচিছেলে নেই, মা কত কাঁদা-কাটা করে, লক্ষ্মী ভাই, বিয়ে কর।" মনে মনে ভাবিলাম, "করিব," প্রকাশ্যে বলিলাম, "পাত্রী কোথায়?" "পাত্রী ঢের আছে, তোমার পছন্দ হইলেই হয়।"

আমি কিছু বলিলাম না, নীরবে আহার ও চিন্তা করিতে লাগিলাম। এত দিন পরে আজ সহসা বিবাহ-মানস কেন? স্বপ্নে প্রণয়িনী দেখিয়াছি বলিয়া? মানিলাম, আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে একদিন আমার প্রতি প্রণয়বতী হইবে। একদিন উভয়ের প্রেম জানিয়া উভয়ে স্বর্গ-সুখ পাইব—সব সই। কিন্তু তার পর? তার পর প্রেমের সে মধুর বন্ধন জীবনের কঠোর বন্ধনে পরিণত হইতে কত দিন? ফুল অতি সুন্দর, অতি সুগন্ধি, তাহাকে মালা করিয়া গলায় পর, কিছুক্ষণের জন্য অতুল প্রীতি পাইবে। কিন্তু সে মহেন্দ্রক্ষণ কি ক্ষীণপরমায়ু, তাহার ভীষণ উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই সেই ফুলে মলিনতা ও গন্ধহীনতা এবং সেই ফুলের প্রতি বিরাগ লইয়া আসিবে। স্বপ্নে প্রণয়িনী ভাল, জীবনে প্রণয়িনী হয়ত আরও ভাল, যদি নাকি সে জীবন স্বপ্নেরই মত সংক্ষেপ ও সুমধুর হয়। প্রেমিকবর! প্রেমের লোভে বিবাহ করিবে, প্রেম পালাইবে, বাকী থাকিবে কি? দীর্ঘ-জীবন

ধরিয়া ঘরকন্না; ঝগড়া ও ভাব; অশ্রুজল ও মানভঞ্জন; বাঁটনা বাটিতে গিয়া গৃহিণীর আঙ্গুলছ্যাঁচা এবং মৎকর্তৃক তাহাতে আর্ণিকালেপন, স্বামীদেবের কালো আল্‌পাকার চাপকানে বোতাম-সংযোজনরূপ আর্য্যনারী-ব্রতে তাঁহাকে নিষ্ফল ব্রতীকরণ-প্রয়াস এবং একটুখানি উদরান্নের জন্য আফিসে অনেকখানি বৃথা হা-হুতাশ। না বাপু, বিবাহ করা আমার কাজ নয়।

চিন্তা ফুরাইল, আহারও শেষ হইল। প্রভা ভারি বুদ্ধিমতী, বোধ হয়, আমার চিন্তার প্রণালীটা কতকটা আঁচিয়াছিল, আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল, আর কিছু বলিল না। অন্তঃপুরে আসিলেই বিবাহের জন্য আমার উপর অন্যান্য আত্মীয়াদের পীড়ন চলিত, প্রভাই শুধু আমার মন জানিয়া মাঝে মাঝে মৃদু আবদারের ভাবে মাত্র সে কথা পাড়িত।

আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দক্ষিণমুখী কক্ষে ঢালা বিছানায় আশ্রয় লইলাম। খোলা জানালা দিয়া

নব-বর্ষের স্বপ্ন

ঈষৎ তপ্ত বায়ু আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। আমি অর্দ্ধ-শয়নাবস্থায় বাটীর সম্মুখস্থ ছোট রাস্তা দিয়া মানুষের গতি-বিধি দেখিতেছি। দেখিতেছি, প্রাচীরের বাহিরে বৃহৎ দীর্ঘিকায় বালকদের অবিরাম দাপাদাপি, বধূবর্গের সমান যত্নের সহিত গাত্র ও বাসন-মার্জ্জন, এবং পুরুষদের বালক ও বধূবর্গের অলক্ষিত স্নান সম্বন্ধে একরূপ গম্ভীর প্র্যাক্টিক্যাল ভাব। আমার হাতে একখানা ফরাসীস্ কবিতা-পুস্তক খোলা রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহাতেও মনো-নিবেশ করিতেছি। বিবাহ নাই করিলাম, প্রেমের স্বাদ জানিতে ক্ষতি কি? উহার জমাট জটিল রহস্যের মধ্যে একবার বুদ্ধি-ছুরিখানা প্রেরণ করিয়া, সবটা ঘাঁটিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া জিনিষটাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কের সাধ্য নয় ও অতলস্পর্শের তল পাওয়া, হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থের সন্ধান থাকে ত তাহাকে পাঠাও—সেটাই কিছু শক্ত কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এমনিভাবে পাঠে, চিন্তায় ও দিবাস্বপ্নে বেলাটা এক-রকম কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে উঠিলাম। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে, বাতাসে চতুর্দ্দিক্ হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। প্রাচীরের বাহিরেই একদল চাষা গাহিতেছে,—

'সই তোরে বল্‌ব কি, রসের গৌর হেরেছি,
হেরে পাগল হয়েছি।
আবার সুরধুনীর তীরে গৌর দাঁইড়ে পেলাম দেখা
কুল যায় না রাখা, গৌর বাঁকা, রসে মাখা মাখা।'

রাধিকা ঠাকুরাণী সুরধুনীর তীরে গৌরের দর্শন পাইয়া পাগল হইয়াছিলেন। গানের ভাবখানা এতদূর বেশ পরিষ্কার নাই বলিয়া কলিকাতা সহরের গোটাকত চাষা ভাঙ্গা গলায় সপ্তমে চেঁচাইতে চেষ্টা করিয়া পাড়া-পড়শীকে কেন পাগল করিয়া তুলিবে, গানের এ অংশের অর্থটা তাদৃশ পরিষ্কার নয়।

আর একদল গাহিতেছে—

'মদনমোহন বাঁধা দিয়ে তালুকমুলুক যায়
হায়! হায়!
এম্‌নি দলপতি ইনি আমাদের রামপ্রসাদ ঠাকুর
হায় হায় রে মজা! হায় রে হায়!!!'

আর কিছু না হউক, মদনমোহন বাঁধা রাখিয়া তালুকমুলুক ঘুরিতে যাওয়ার রামপ্রসাদ ঠাকুরের আইডিয়ার ওরিজিন্যালিটি প্রকাশ পাইতেছে বটে। আবার ঐ শোন! দীঘির ধারে বসিয়া কৃষ্ণকুণ্ডের বংশধরটি ক্ল্যারিওনেটে তাঁহার সমস্ত হৃদয়াবেশ ঢালিয়া দিতেছেন। বেসুরো সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতাসে ভাসিয়া না জানি কোন্ বিরহিণীর কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিতেছে। আর একটু বেশী রাত্রে যখন আমার প্রতিবেশীদের ঐক্যতান সঙ্গীতের বিরাম হইল, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম-চেয়ারে উপবেশন করিলাম; আমরা চারিটি সঙ্গী পরস্পরকে সঙ্গদান করিতেছিলাম। আমি, আমার চিন্তা, আমার গলার বেলফুলের মালা ও সপ্তমীর চাঁদ।

এইরূপে ত নব-বর্ষ কাটিল। প্রভাতে যে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বেশ রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। কিন্তু তাহার পরদিন উঠিয়া পূর্ব্বদিনের গদ্গদভাব স্মরণ করিয়া আপনার নিকট আপনি লজ্জিত হইলাম। আর দুই একদিনের অনভ্যস্ত সেণ্টিমেণ্ট্যালিটি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পুনরায় নীরস গদ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থ, খাড়া হইয়া উঠিলাম। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করিতে হইল, আমার বিশ্বাস, নব-বর্ষের স্বপ্ন আমার বিদ্রূপশীল স্বভাবকে বেশ একটুখানি ঝাঁকা দিয়া আমায় খানিক কাহিল করিয়া গিয়াছিল, জমি কতক নরম হইয়া অঙ্কু-রের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা না হইলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিবার আর ত কোন কারণ দেখিতে পাই না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাসকতক কাটিয়া গিয়াছে। স্বপ্নের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। স্বপ্নাভিভূত হইবার অবসরও অতি অল্প। সামনেই পরীক্ষার দিন। এখন কেবল স্তূপাকৃত আইন-পুস্তকের সহিত দিন-রাত্রি সহবাস, "অষ্টিন্‌স জুরিস্‌-প্রুডেন্স" "মেন্‌স হিন্দু ল" ইহারাই আজকাল প্রাণের দোসর হইয়া উঠিয়াছে, ফরাসীস্‌ কবিতা-পুস্তকের স্মৃতি এখন বহুদূরে। একদিন সমস্ত দিন পড়িয়া পড়িয়া নিতান্ত শ্রান্তি বোধ হওয়াতে বিকালের দিকে সকাল সকাল বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাকতক গোলদীঘির ধারে বন্ধুবর্গ এবং খোলাবাতাসের হাতে নিজেকে ছাড়ান দিয়া সন্ধ্যার সময় একটুখানি তাজা মাথা লইয়া বাড়ী ফিরা গেল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

না উঠিতে একটি কারণে বড় বিস্মিত হইলাম। উপর হইতে হারমোনিয়মের আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। আমার কনিষ্ঠটির কিছু কিছু গান-বাজনার সখ আছে, মাসিকপত্রের সঙ্গীত স্বরলিপি অধ্যয়ন করিয়া সুর আদায়ের চেষ্টাটা তাঁহার প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ভায়ার হাতে হারমোনি ফ্লুট এমন মিষ্ট বলে না। নিশ্চিত বুঝিলাম, এ নির্ম্মলের বাজান নহে। উপরে না উঠিয়া নীচে দাঁড়াইয়া একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপরে কে আসিয়াছে?" চাকর বলিল, "ও বাড়ীর বড় বৌদিদি ঠাকৃরুণ।"

"আর কেউ নয়?"

"তাঁর সঙ্গে আর একটি মেয়ে আছেন, বোধ করি, তাঁর খুড়তুতো বোন হবেন।"

আমিও ভাবিলাম, তাহাই সম্ভব বটে, শুনিয়াছিলাম, বৌদিদির খুড়ামহাশয় কিছু একাল-ঘেঁষা, লোক-লোকাচারের ততটা একার রাখেন না, নিজের কন্যাদের

ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, এমন কি, ঘরে ওস্তাদ্ রাখিয়া তাঁহাদের সঙ্গীতবিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। এই ভাবিতে ভাবিতে আমি উপরে উঠিতেছি, এমন সময় আমাদের গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া গানের শব্দ উত্থিত হইল। গলা ভারি মিঠে, খানিকটা দাঁড়াইয়া মনোযোগ দিয়া গানের কথাগুলি শুনিলাম।

"সুখে আছি, সুখে আছি,
সখা আপন মনে,
কিছু চেও না, দূরে যেও না
শুধু চেয়ে দেখ,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।

সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম
নীরবে দিবে প্রাণ
রচিয়া ললিত মধুর বাণী
আড়ালে গাবে গান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপনে তুলিয়া, কুসুম গাঁথিয়া
রেখে যাবে মালাগাছি
মন চেও না, শুধু চেয়ে দেখ,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।"

এ গান পূর্ব্বেই কেতাবে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ দেখিলাম, কেতাবে গান পড়া এক, আর নারীকণ্ঠে তাহা শুনা এক। আজ এই বালিকার কণ্ঠে এই গানটি যেন নূতন প্রাণ পাইল। তাহার যন্ত্রের সঙ্গত, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী এবং গানের কথা সবে মিলিয়া নিবিড় করিয়া গানের ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিল। গান শুনিয়া মনে মনে একটু হাস্যেরও উদয় হইল। আমাদের স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ হইল। জানিলাম, এই মর্ত্ত্যধামে আমরা কতকটা আবশ্যক, বেশী নহি; আমাদের আত্মোৎসর্গ সুন্দর, আমরা অসুন্দর; পুরুষ-জাতির আত্মাভিমান ইহাতে তুষ্ট হউক আর না হউক, ইহা সত্য যে, সুন্দরীগণের জীবনের মাধুরীর হিল্লোলের মাঝে

আমাদের অন্যায় আব্‌দারের এক একটা ঢেউ আসিয়া বড় রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

যে ঘরে গান হইতেছিল, তাহার পাশেই আমার পাঠ-গৃহ। আমি এতক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া গান শুনিতেছিলাম। গান শেষ হইলে গৃহে প্রবেশকালে মা আমার পদশব্দ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কিরণ, তোর মাথা ধরাটা কি সেরেছে ?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া চৌকাঠের এক পাশে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হাঁ', সেরে গেছে।"

মা বলিলেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ঘরে আয় না, ও বাড়ীর বড় বৌমা এয়েছেন, তোর সঙ্গে দেখা হ'ল না ব'লে দুঃখু কর্‌ছিলেন।"

মায়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই বউদিদি ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না।"

তখন আমাকে অগত্যা গৃহে প্রবেশ করিতে

হইল। একঘর লোক,—মা, প্রভা, দুটি একটি প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, বৌদিদির দু তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে, তিনি এবং তাঁর পাশে একটি তের চৌদ্দ বৎসরের তন্বী বালিকা,—তিনিই বৌদিদির খুড়তুতো বোন চারুশীলা,—নাম পরে শুনিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যেন তিনি আমাকে দেখিয়া লজ্জায় একটুখানি সঙ্কুচিত হইলেন। আমি তাই আরও দ্বিগুণ অপ্রতিভ হইয়া বৌদিদির সহিত দুটো একটা কথা কহিয়াই চম্পট দিলাম। একেবারে একতালায় নামিয়া আসিয়া একখানা বই খুলিয়া পড়িতে বসিলাম। দেখিলাম, ভুল বই আনিয়াছি, কিন্তু আবার উপরে গিয়া ঠিক বইখানা আনিতে প্রবৃত্তি হইল না, মনে হইল, আবার হয় ত সকলে আমার পদশব্দ শুনিতে পাই-বেন, আবার ধরা পড়িব। কিছুক্ষণ পরে খুব নীরব বোধ হওয়াতে নির্ম্মলকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ ত, বৌদিদিরা চ'লে গেছেন কি না?"

সে আসিয়া বলিল, "না, এখনও যান নি, তাঁরা

বাড়ীর ভিতর জল খেতে গেছেন।" জানিলাম, এখন তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে উপরে যাইতে পারি। জলযোগ করিয়া এই পথ দিয়া তাঁহাদের নীচে নামিবার সম্ভাবনা— স্মরণ করিয়া আমি গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পড়িতে বসিলাম। খানিক পরে অনেকের পায়ের শব্দ পাইলাম। ভাবিলাম, বৌদিদিরা বোধ হয় গমনোন্মুখ। তাহা নয়, পাশের ঘরের সে শব্দ নিবৃত্ত হইল। আবার গান চলিতে লাগিল। এবার গান শুনিলাম—

'কিছুই ত হোল না
সেই সব সেই সব
সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু-বারিধারা
হৃদয়-বেদনা।'

আমার আইন পড়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা ভারি বিস্মিত হইলাম। চকিতে যে সেই ক্ষীণ, মাধুর্য্যপূর্ণ দেহলতা দেখিয়াছিলাম, তাহারই ভিতর এতখানি প্রাণ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুখ কানায় কানায় ভরিয়াছিল, গায়িকার ও শ্রোতার হৃদয়ময় উছলিয়া পড়িতেছিল, আর এরই মধ্যে এত হৃদয়ভেদী নৈরাশ্য, এমন জীবনমন্থন করা তীব্র যাতনা কোন্ উৎস হইতে ঝরিতে লাগিল? কি অপরূপ শিল্পী!

ক্রমে এই গানটি আমাকে পাইতে লাগিল; গান শুনিতে শুনিতে মনে ভারি একটা চঞ্চলতা উপস্থিত হইল; একটা কোন অজ্ঞাত, অপরিচিত দুঃখ-সম্ভাবনায় হৃদয় পীড়িত, উদাস, বিহ্বল হইতে লাগিল। আমি টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাম্‌নেই উদ্যান,—জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। সেই জ্যোৎস্না-বিস্তারের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। নব-বর্ষের স্বপ্নের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে প্রেমে পড়ার সহজতা স্মৃতিপথে উদয় হইল; নদীতীরে দাঁড়াইয়া জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান যেমন সহজ—একটি ঝাঁপের প্রতীক্ষা মাত্র—আমি মনে মনে কল্পনায় সেই

ঝাঁপের সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন আমার ভালবাসার প্রবৃত্তি—এই বালিকাটীতে লিপ্ত হইতে লাগিল। আবার একটা গান শুনিতে পাইলাম।—

'নীরব রজনী অতি মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও।'

আমারই মনের কথা—কি ধীরে, কি সুমিষ্টরূপে, প্রেমাভাষের মত করিয়া গাহিয়া বলিল। আমি জানালার উপর হাত রাখিয়া, তাহার উপর মাথা নামাইয়া কপাল ন্যস্ত করিলাম। এইরূপ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, বাহির হইতে দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাড়াতাড়ি মুখে চোখে স্বাভাবিক প্রশান্ততার ভাব ফিরাইয়া আনিয়া নিঃশব্দে টেবিলের সম্মুখে পুনরু-পবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে? কি চাই?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাহির হইতে প্রভা বলিল, "দাদা, আমি। দরজা খোল, দরকার আছে।"

আমি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌদিদিরা এখনো যাননি? অনেক ত রাত হয়েছে।"

প্রভা বলিল, "গেছেন, এই আমি তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌ছি, তোমার ঘরের সাম্‌নে দিয়ে সবাই গেলুম, পায়ের শব্দ পাওনি? খুব ত এক মনে পড়্‌ছিলে?"

আমার অপরাধী চিত্ত সন্দেহ করিল, প্রভার শেষ কথাটায় যেন একটু গুপ্ত বিদ্রূপ নিহিত ছিল। "সে যা হোক্, তুই কি চাস্?"

"কিছু না, এই তোমার সঙ্গে একটু গল্প কর্ত্তে এলুম; তুমি বোসো দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল গল্প জমে না;—দাদা, চারুশীলাকে লাগ্‌লো কেমন? পছন্দ হয় না? কেমন গান শুন্‌লে বল দিকিন?"

প্রভার প্রশ্নের স্বরে ও ধরণে আমার বড় সন্দেহ

হইল, আমি খুব শুষ্কস্বরে বলিলাম, "মন্দ নয়, তোর এই বুঝি দরকার? যা যা, এখন আমার গল্প জমাবার সময় নয়, দেখ্‌ছিস্‌নে, এখন চার আইনের পাঁচ ধারা নিয়ে কি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছি?"

"তা হ'লে তোমার সঙ্গে চারুশীলার সম্বন্ধ করি?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিন্তু চট্ করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলাম, "তুই খেপেছিস্ নাকি? কোথাও কিছু নেই, যার তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ?"

"না দাদা, আমি খেপিনি, পয়লা বোশেখের দিন তোমারই দুটো একটা খ্যাপবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। আমি তোমার পরম হিতৈষী, সেই পর্য্যন্ত তোমার রোগের ঔষুধের সন্ধানে আছি। বোধ হচ্চে, এত দিনে ভাগ্যিক্রমে ঠিক বড়িটি মিলেছে, এখন তোমাকে গলাধঃকরণ করাতে পার্‌লেই হয়।"

আমি প্রভার নারীসুলভ তীক্ষ্ণ অনুমান-শক্তিতে পরম বিস্মিত হইলাম, তাহার সেই দিনকার নীরব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসির অর্থ এতক্ষণে বুঝিলাম, মনে মনে মহা অপ্রতিভ হইলাম; কিন্তু মুখে ভারি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "আজ যে বৌদিদির বোন এসেছিলেন, সে তবে আমাকে না ব'লে কয়ে তাঁকে কনে দেখাতে আনা হ'য়েছিল? আমি কক্ষণো বিয়ে কর্‌ব না।"

প্রভা তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া সমান সপ্রতিভ-ভাবে বলিল, "চারুশীলাকে কনে দেখাতে আনা হয়নি, ওর বাপ-মারা কনে দেখাতে আমাদের বাড়ী মেয়ে পাঠাবে না; আমার চারুকে অনেক দিন ধ'রে দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, আর চারুর গানের বড় খ্যাতি শুনেছিলুম, ওর মুখে গোটাকতক ভাল ভাল গান শোন্‌বার ইচ্ছা ছিল, তাই আমি বৌদিদিকে বলেছিলুম, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে নিয়ে আস্‌তে,—আর সেই সঙ্গে তোমার হিতটাও যে একেবারেই মনে ছিল না—তা নয়; সে যা হোক গে দাদা, তুমি যে এইমাত্র বল্লে, কক্ষণো বিয়ে কর্‌বে না, এ কথা আর যেন মুখে এনো না, তা হ'লে

সত্যচ্যুত হ'তে হবে। যেহেতু, তোমার আইবুড় থাকবার মতন লক্ষণ দেখাচ্ছে না।"

আমি একটা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে বাধা দিয়া সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। ছুটো একটা কথা স্ত্রীসুলভ অসমসাহসিকতায় আন্দাজে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল, এমন আভাষ দিল যে, আমাকে বিবাহে লওয়ান মায়ের চোখের জল বা প্রভার অনুরোধের কর্ম্ম নয় বটে, কিন্তু আজ একটা মিষ্টি মুখ আর একটুখানি মিঠে আওয়াজে অনেকটা কাজ সাবাড় হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার ভীরু অনুরাগ যদিবা এই চারু কুসুমে বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু প্রভার রহস্যবাক্যে তাহা সত্বর সম্পন্ন হইয়া গেল, বজ্রলেপে আমার অনুরাগ তাহাতে বদ্ধ হইল। ঠাকুরাণীর কথা ফলিল, আমার পাকা হাড়ে রোগ ধরিল, এবং রোগের সকল লক্ষণগুলিই আমাতে একে একে দেখা দিল;—সেই সনাতন ক্ষুধা-মান্দ্য ও শরীরের অবসাদ; সেই চেহারা লক্ষ্মীছাড়া ও মেজাজ খিট্‌খিটে। মনসিজের মৃদুশর হইতে কেহই মুক্ত নহেন বটে,—শর্ম্মাও নয়? এই সময় আমায় দেখিলে এবং আমার রোগের নির্ণয়ে সমর্থ হইলে ঠাকুরাণীর পর-সুখদ্বেষিতা বিশেষ চরিতার্থতা লাভ করিত এমন বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন বহুদূরে, পশ্চিমে—দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যোচিত, তদ্গতচিত্ততার

সহিত আফিস হইতে প্রত্যাগত বুড়া স্বামীর যত্নের আয়োজনে বিব্রত।

প্রভার দুষ্টুমির অন্ত পাওয়া ভার। তাহার পরদিন হইতে কোন্ নূতন মতি পরিচালিত হইয়া হঠাৎ অত্যন্ত সংযতবাক্ হইয়া উঠিল। আর ভুলিয়াও চারুশীলার নাম উচ্চারণ করে না, বোধ হয়, ফন্দিটা যে, আমি নিজের গরজে আপনা হইতেই তাহার সহিত সে কথা পাড়িব। আমি কিন্তু কোন কথা পাড়ি না, নিজের কাছেই ভাণ করিতে চেষ্টা করি, যেন আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, যেন আমার জীবনের গতি আগে যেরূপ চলিতেছিল, এখনও সেইরূপ চলিতেছে। কিন্তু নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ি। যখন হঠাৎ অনুভব করি, কি একটা গুরুভার মনের উপর চাপিয়া আছে, তাহা সুখের ভার কি দুঃখের ভার, বলিতে পারি না, জানি, তাহা আমার নূতন হৃদয়সঙ্গী, নবানুরাগ। চারুকে আর একবার দেখিবার প্রবল সাধ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হপ্তাকতক পরে প্রভা একদিন আসিয়া বলিল, "দাদা, আমায় একদিন বৌদিদিদের বাড়ী পাল্টা যেতে হবে। কিন্তু ওর বাপের বাড়ী আগে আর কখনও যাইনি, আমি একলা যেতে পারব না, তোমাকে আমায় সঙ্গে ক'রে রেখে আসতে হবে।"

এ বন্দোবস্তে যদি বা আমার আপত্তি থাকিত, তবু প্রভার সঙ্গে পারিয়া উঠিব না জানিতাম, তবুও একবার বলিলাম, "আমার যাবার দরকার কি? নির্ম্মল তোর সঙ্গে যাক্ না?"

"না, সে হবে না, নির্ম্মল ছেলেমানুষ, সে গিয়ে ত আর হেঁটে ফিরে আসতে পারবে না, আর তাদের বাড়ীতে তার সমবয়সী ছেলেও নেই যে, তাদের সঙ্গে ব'সে গল্প করবে, তুমি আমাকে পৌছে দিয়ে চ'লে এসো।"

প্রভার হুকুম না মানিয়া উপায় নাই, নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহাকে পৌছাইয়া দিতে গেলাম। বৌদিদিরা

প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারে গাড়ী থামিবামাত্র চারুশীলা গাড়ীর নিকটে আসিয়া প্রভার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইল। প্রভার কৌশলকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেকখানি সুখ লইয়া—এখন শুধু দেখায় যে আমার কত সুখ, তোমাদের কিরূপে বুঝাইব?—গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইতেছিলাম, পূর্ব্ববন্দোবস্তমত প্রভার জন্য চাকর রাখিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু বৌদিদি ইতিমধ্যে খবর পাইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমাকে এখন ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। নানা প্রকার আলাপ-আলোচনায় তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রভার সহিত একত্রে বাড়ী ফিরিলাম। আমি একবার ভাবিয়াছিলাম, প্রভার সহিত গাড়ীতে মিছামিছি ঝগড়া করিব, তাহার দোষে ধরা পড়িয়া আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল, এতক্ষণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পড়া কামাই হইল ইত্যাদি বলিয়া মিথ্যা অসন্তোষ প্রকাশ করিব। কিন্তু পারিলাম না, আজ অভিনয়ে মন উঠিল না। যে সুখ সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই উপভোগে গাড়ীতে মৌনভাবে কাটাইলাম, প্রভাও কোন কথা বলিল না।

আমাদের উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতার আজ এই সূত্রপাত হইল। তাহার পর প্রায়ই যাতায়াত চলিতে লাগিল। চারুশীলার ভ্রাতাদের সহিত আমার সম্প্রীতি জন্মিল, তাহার পিতার সহিত পরিচয় হইল। ক্রমে বৌদিদির সম্পর্কে চারুর সহিত নিঃসঙ্কোচ বাক্যালাপ করিবার মত ঘনিষ্ঠতাও জন্মিল। একটা সুবিধা এই হইয়াছিল যে, আমার একজন বন্ধু একটি সদ্য বিলাত প্রত্যাগত ছোকরা, বিপিন, তাহাদেরও বন্ধু। বিপিনের পিতা অঘোর বাবুর অতি প্রিয় সুহৃদ্ ছিলেন, তাই বিপিনের তাঁহাদের গৃহে অসঙ্কোচ গতিবিধি ছিল। সে এক এক দিন বৈকালে আমাদের বাড়ী আসিয়া

আমাকে তুলিয়া লইয়া সেখানে যাইত। আমাদের আপনাআপনির মধ্যে চারুশীলার কথা প্রায়ই হইত, বিপিন শতমুখে তাহার গুণগান করিত, আমি সানন্দে তাহা শুনিতাম। আমার পৌরুষিক স্থূল বুদ্ধিতে কখন সন্দেহ করিতাম না, তাহার গুণগান হয় ত আমারই মত অনুরাগের আধিক্যপ্রসূত।

যথাকালে আমার পরীক্ষার দিন আসিল, পরীক্ষা দিয়া আসিলাম, পাশের সংবাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আর আমার লজ্জা কিংবা দ্বিধা নাই, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি, পাশের সংবাদ পাওয়ার পর চারুকে বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিব, তখন তাহার পিতার নিকট রীতিমত প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইবে। অঘোর বাবুর নিকট যে সে প্রস্তাব নিতান্ত অগ্রাহ্য হইবে না, এরূপ আশা করার আমার আত্মম্ভরিতা ছাড়া আরও কতকগুলি সমূলক কারণ ছিল। আমার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, আমাদের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনেদী ঘর, বিষয়-আশয় যাহা আছে, তাহাতে এখনও তিন পুরুষের অন্নসংস্থান হয়। ওকালতী আমার জীবিকার জন্য অত্যাবশ্যক নহে, অন্যরূপ কর্ত্তব্যবোধ হইতে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি;—কর্ম্মহীন, অলস জীবন অনেক মন্দ অভ্যাসের জনয়িতা, তাহার নিবারণের জন্য আমার পেশাগ্রহণ।

এইখানে আমার একটা অদূরদর্শিতার কথা সকলের মনে উদয় হইবে। অঘোর বাবুর নিকট আমার প্রস্তাব যেন অগ্রাহ্য হইল না, কিন্তু চারুর নিকট যে তাহা গ্রাহ্য হইবে, তাহা কেমন করিয়া জানিলাম? আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু এমন নিজের ভাবে ভোর হইয়াছিলাম যে, চারু যে আমার অনুরাগে সাড়া না দিতেও পারে, এ কথা একবারের জন্যও মনে হয় নাই। চারুর হৃদয় যে আমি পাইব ইহা যেন স্থির, শুধু অঘোর বাবুর সম্মতির প্রতীক্ষা মাত্র। এরূপ বিশ্বাস কতটা আমার আত্মম্ভরিতা, কতটা আমার

চিরন্তন বাঙ্গালী সংস্কার-প্রসূত ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই অন্ধ বিশ্বাসের সুখে আমি নিজেকে একান্ত মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।

পাশের খবর বাহির হইবার পূর্ব্বেই অঘোর বাবুকে আমার অভিলাষ জানান যাইতে পারিত, কিন্তু এই বিলম্বটুকু আমার একটা খেয়াল, এ যেন উপভোগরসকে একটু মজাইয়া মজাইয়া দ্বিগুণ সুস্বাদু করিবার বাসনা। কিন্তু ইতিমধ্যে কদিন হইতে প্রভার হঠাৎ মত্যন্তর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আর ততটা বৌদিদের বাড়ী যাইতে চাহে না, আমাকেও প্রকারান্তরে নিবারণ করে। দিন কতক পরে দেখিলাম, আমাদের বাড়ীতে ঘটকীর ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হইল। প্রভা একদিন আসিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, অমুক জায়গায় একটা বিশেষ ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে, আমায় অল্পদিনের মধ্যে বিবাহ করিতে হইবে। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বিকালে বেড়াইতে

বেড়াইতে চারুশীলাদের বাড়ী যাইলাম। প্রভা জানিল, কোথায় গিয়াছিলাম। তাহার পরদিন হইতে আরও বেশী রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। আমি অবশেষে এই নূতন রঙ্গে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, রুক্ষস্বরে বলিলাম, "প্রভা, আমাকে বার বার এ কথা ব'লে বিরক্ত কোরো না, আমি ওখানে বিয়ে কর্‌বো না।"

প্রভা দাঁড়াইয়াছিল, সহসা আমার পদতলে পড়িয়া কাতর অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "দাদা, আমাকে মাপ কর ভাই, মাপ কর। তুমি যাকে চাও, আমি জানি, কিন্তু তাকে পাবে না। সে দিন সবে শুন্‌লুম, সে আর এক জনের বাগ্‌দত্তা।"

আমার গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল; আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সাধ্য হইল না যে, প্রভাকে উঠাই।

আমাকে এরূপ অস্বাভাবিক মৌন ও নিস্তব্ধ দেখিয়া সে দ্বিগুণ আকুলতার সহিত বলিতে লাগিল, "আমি

হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দেওয়া হইয়াছিল। আর কন্যার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা আলোচিতই হয় নাই, সে কথা কাহারও মনেই আসে নাই,—ইহা ধরা কথা, পিতা তাহার জন্য যে বর মনোনীত করিবেন, সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। তাই বিপিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও চারুশীলা বাগ্‌দত্তা হইয়াছিল। অর্থাৎ বিপিন যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে; বিপিন যদি না চায়, তখন তাহাকে পাত্রান্তরে ন্যস্ত করা হইবে। এরূপ বন্দোবস্তে কন্যাপক্ষের যে অনেকখানি হীনতা স্বীকার করা হইল, এরূপ অভিমান অঘোর বাবুর মনে উদয় হয় নাই। তাহার কারণ, এ বন্দোবস্ত তাঁহারা দুজনে আপোষে করিয়াছিলেন। অঘোর বাবুর বাটীর লোকেরাও এত দিন এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না। বিপিনের বিপরীত অভিপ্রায় দেখিলে তিনি এ কথা কখন

প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু বিপিন আজ চার পাঁচ দিন হইল, অঘোর বাবুর নিকট চারুশীলার হস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। এখন তিনি তাই তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদিদির নিকট প্রভা এই সকল কথা শুনিয়াছে। সে আরও শুনিয়াছে যে, বিপিনের প্রস্তাবে হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে অঘোরবাবু চারুশীলার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বিবাহের দিন স্থির করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিপিন তাহাতে ভীত হইয়া বলিয়াছে, "আমার একটি অনুরোধ, চারুর নিজের মত আমাকে জান্‌তে দিন, আপনি অনুগ্রহ ক'রে চারুকে এ বিষয়ে আপাততঃ কিছু বোল্‌বেন না, কেননা, আপনার ইচ্ছা প্রকাশমাত্র সে হয় ত বাধ্য হ'য়ে আমায় গ্রহণ করিবে। আমি চাই, সে নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে, যদি তার মুখে শুনি, সে আমাকে চায় না, সেও ভাল, কিন্তু আপনার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বে যে সে আমায় গ্রহণ ক'রে অসুখী হবে, তা আমি চাই না।"

অঘোর বাবু বিপিনের কথায় ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছেন যে, তাহার এত ভয় অমূলক, চারুর যে তাহাকে বিবাহ করিতে অমত হইবে, ইহা অসম্ভব। আর ছেলেমানুষ, সে এ সবের কি জানে? তার এ বিষয়ে কোন মতামত থাকাই উচিত নয়, তিনি যে বরকে তাহার যোগ্য বিবেচনা করিয়া বিবাহ দিবেন, তাহারই সহিত যে সে সুখে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বিপিনের যখন নিতান্ত ইচ্ছা, তখন তিনি তাহার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবেন, চারুশীলাকে এ বিষয় এখন কিছু জানান হইবে না। বিপিনের সে বাড়ীতে ত অবারিতদ্বার, সে নিজে অবসর খুঁজিয়া চারুকে তাহার মনের ভাব জানাক্, অঘোর বাবুর তাহাতে আপত্তি নাই।

আমরা কন্যার যে নির্ব্বাচনের স্বাধীনতাটুকু গণনার মধ্যে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিলাত-প্রত্যাগত বিপিনের নিকট প্রণয়িনীর সেই স্বাধীন নির্ব্বাচনটুকুই সব চেয়ে মূল্যবান্। যাহা হউক, অঘোর বাবু তাঁহার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছেন, চারু বিপিনকে যাহাই বলুক, বিপিনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির। প্রভার বিবরণ শুনিতে শুনিতে আমি মনে মনে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। রত্ন যখন হাত-ছাড়া, তখন আরও বেশী দ্রুত প্রতিবিধান আবশ্যক। বার বার দেখা-সাক্ষাতে রোগ বৃদ্ধি পাইবে, উপশম হইবে না, তাই চারুর বিবাহের পূর্ব্বে আর কখনও তাহাদের বাড়ী যাইব না স্থির করিলাম। কিন্তু বিপিনের সহিত তাহার বিবাহ কি স্থির? অঘোর বাবু তো বলিয়াছেন স্থির, কিন্তু আমি বিপিনকে যতদূর জানি, চারু যদি অনিচ্ছা দেখায়, সে কখনও তাহার পিতার ইচ্ছায় সুযোগ লইয়া তাহাকে জোর করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত করাইবে না। যদিই চারু বিপিনের ভালবাসার প্রতিদান দিতে না পারে? তাহা না পারুক, আমার কর্ত্তব্য একই পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এতদিন আমি জানিতাম না, এখন যখন জানিয়াছি, তখন আর বন্ধুর সহিত এক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অনুচিত। তবে যদি কোন দিন দুর্ভাগ্য বন্ধু প্রত্যাখ্যাত হইয়া রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করে, তখন কি আমি তাহার ভূমিকা গ্রহণ করিব? তাহা পরে বিবেচ্য।

হপ্তাখানেক শুধু বিপিনের সহিত আমার দেখা হয় নাই। দুই একদিন পরেই সে আসিল। আপনা হইতে চারুশীলার কথা পাড়িল, তাহাকে বিবাহের অভিলাষ ব্যক্ত করিল, অঘোর বাবুর সহিত তাহার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। আমি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাহা না থাকিলে, না জানি, এই অতর্কিত বিশ্রম্ভকথায় কিরূপ আচম্‌কা নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বিপিনকেও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতাম। তাহার পর হইতে সে মাঝে মাঝে যখন তখন আমার নিকট আসিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও ভীতির কাহিনী বলিত। আত্মগোপন আমার স্বভাবসিদ্ধ। আমি প্রশান্তভাবে বিপিনের সব কথা শুনিয়া যাইতাম, আবশ্যকস্থলে দুটো একটা অভিমতও ব্যক্ত করিতাম।

বিপিন স্বপ্নেও মনে করিত না, আমি আর সে নির্লিপ্ত নিঃস্বার্থ শ্রোতা নাই।

আমি অঘোর বাবুর বাড়ী আর যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না, বিপিনই দুই চারিবার টানিয়া লইয়া গেল। আমি কোন ওজর করিতে পারিলাম না।

এইরূপে মাস কতক যায়। একদিন বিপিন আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া প্রথম দুই একটা কথাবার্ত্তার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, "আমি আসচে মঙ্গলবারে বর্ম্মায় যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে একটা ভাল রকম offer পেয়েছি।" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি বিপিনের চিরকালের স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহে সংকল্প জানিতাম। গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে কাজকে সে দাস্যবৃত্তি বলিয়া জ্ঞান করিত, আর এই কমাসেই ত দেশে তাহার মন্দ পসার জমে নাই, তবে হঠাৎ এ নূতন সংকল্প কেন?

আমি একটু পরিহাসের ভাবে তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম। সে গভীরস্বরে সংক্ষেপে বলিল, "চারুকে বিবাহের কথা বলিয়াছিলাম, তাহার মুখে শুনিলাম, আমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। আমার নিজের কথা তখন ভুলিয়া গেলাম, শুধু বন্ধুর দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সান্ত্বনা বাক্য মনে আসিল না। বিপিন চলিয়া গেল। তখন আমার মাথার ভিতর ঝটিকা বহিতে লাগিল। বিপিনকে ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না! চারু কি বলিয়াছে? বিপিনকে ভালবাসা তার একেবারে অসম্ভব কেন? আগে হইতে আর কাহারও প্রতি অনুরক্ত না হইলে, সোজাসুজি কোন যোগ্য লোকের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া ত তেমন শক্ত কথা নহে? অসম্ভব কেন? আমি কি কিছু অনুমান

করিব ? আমার আশাতীত, স্বপ্নাতীত সুখ সত্যই কি আমার সহজলভ্য ? কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবু অলক্ষ্যে মনে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহাদের বাড়ী যাইতে পারিলাম না। সে কথা ভাবিলেই পা বাধিয়া যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে অঘোর বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "ছেলেরা বল্‌ছিলো, অনেক দিন তুমি আর ওদিকে আস টাস না, আফিস যেতে আরম্ভ করেছ বুঝি ? "া একদিন রবিবারে যেও না ?" আমি বাধ্য হইয়া স্বীকৃত হইলাম।

রবিবারে যাইলাম। আজ যেন চারুশীলাতে কেমন একটু বদল দেখিতে পাইলাম। যেন শেষ যেবার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা হঠাৎ অনেকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, যেন পুরুষ-হৃদয়-দলনে তাহার অজ্ঞাত শক্তি আবিষ্কার করিয়া সে একদিনে তাহার নারীত্বের সমস্ত

দায়টা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। সে আর তাই বালিকা নহে, গম্ভীর আত্মসংযতা নারী, অল্প বিষণ্ণা। হইতে পারে এ পরিবর্ত্তন চারুতে বাস্তবিক নাই, ইহা শুধু আমার কল্পনার জীব, তবু এ পরিবর্ত্তন কল্পনায়ও তাহাকে আমার আরও ভাল লাগিল। আর একটা কারণে আজ তাহাকে আমি একটু নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলাম। বিপিনের সঙ্গে শেষ যে কটা দিন আসিয়াছিলাম, সে দিনগুলো বড় অশোয়াস্তিতে কাটিয়াছিল, তাহাকে মনে মনে ভাল বাসিলেও ভিতরে ভিতরে একটা জ্ঞান ছিল যে, আমার আর ভালবাসিবার অধিকার নাই, এ ভালবাসায় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হইতেছে, তাই পূরোপূরি ভাল-বাসিতে পারিতাম না, নিজের মনে মনেও কতকটা সঙ্কোচ থাকিত, আজ আর কোন সঙ্কোচ নাই। নিরাশ্বাস বন্ধুর প্রতি আমার আর কোন দায় নাই, আজ আমার প্রেম ছাড়া পাইতে পারে,—আজ তাই একটা স্বাধীনতার সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ফিরে আবার রবিবারে

যাইলাম। আজ মনে হইল শুধুই ভাল বাসিয়াই সুখ বটে, কিন্তু একটুখানি জানান দেওয়ার সুখই বা মন্দ কি? কোন একটা কথা বিশেষ রকমে বলা, একটা ভাব কি একটা দৃষ্টিতে একটুখানি প্রেম মাখাইয়া দেওয়া। তাহার পরের বারে মনে হইল, কেন না লাভ করিতে চেষ্টা করিব? সে দিন আমি অকুতোভয়ে প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্য হইল। কি করিতেছি? আর দুদিনে কোথায় গড়াইবে? এ যে মরণান্ত খেলা, কেন নিজেকে এ খেলায় এত মত্ত করিতেছি, এ নেশা ত আর কাটাইতে পারিব না? যদিই তাহাকে না পাই? একবার নিজের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়া আমার অন্তর্দৃষ্টি এখন প্রখর হইয়াছে, —তাহার স্থৈর্য্য তাহার প্রশান্তভাব দেখিয়া ত আশ্বাস [illegible] না। আমার আবেগ তাহারও হৃদয়ে কোন তরঙ্গ তুলিয়াছে। হায়! দুর্ব্বল কাপুরুষ! প্রেম সর্ব্বস্ব পুরুষ! অপরাধী তুমি! তোমার বিচারক তোমার

প্রণয়িণী, সে দেবতার মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার। পৌরুষ দম্ভে জয়লাভ করিতে চাও কাহার উপর? আত্ম সম্মান রাখিতে চাও ত জগৎ হাসান পরাজয়ের পূর্ব্বে এখনও পালাও। তাই করিলাম। সেখানে যাওয়া বন্ধ করিলাম। কলিকাতা অসহ্য হইয়া উঠিল, ওকালতী অসম্ভব। কিছু-দিনের জন্য দার্জ্জিলিঙে যাইলাম। সেখানে তিন মাস অবস্থান করিলাম, মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল।—

দার্জ্জিলিঙের শোভা প্রাচুর্য্যে নয়ন রঞ্জনে মনোরঞ্জন আপনি হইয়া পড়ে। দেখিবার জিনিষও ত কম নহে, চোখকে একবার ছুটি দিলেই হইল। সাদা রং টুকটুকে গাল বিলম্বিত বেণী ভূটিয়া রমণী, ফুটফুটে ইংরেজ ছেলে মেয়ে, তুঙ্গ শৃঙ্গ, অপূর্ব্ব সুন্দর মেঘ, কল্লোলিনী নির্ঝরিণী, কাঞ্চন গিরিমালা, আলোছায়া মত তরুপথ—প্রতি নয়ন পাতে বিনা আয়াসে ইহাদের একটি না একটিতে চোখ জুড়াইতেছে মনও জুড়াইতেছে। সেই তীব্র শীতের বাতাসে ঘোড়া ছুটাইতেই বা কি আরাম। একচিন্তাহীন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতীতহীন, উন্মত্ত উদ্ধশ্বাসগতির সুখ। মাঝে মাঝে যদি মনে হইত, প্রকৃতির এই শ্যামল চিত্রপটের উপর মধ্যাহ্নের আলোয় নির্ঝরিণীর ধারে একখানি মুখ বড় মিষ্ট মানাইত, একটি মানবীসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এখনকার এই সৌন্দর্য্য উপভোগের সুখ সম্পূর্ণ হইতেছে না ; কোন দিন যদি তাহার কথা মনে করিয়া হৃদয়ে অধীরতা আসিত, তবে নিজেকে শাসন করিতাম। এই চিত্তচাঞ্চল্যের সুত্রপাত হইলেই তাহার অমোঘ ঔষধস্বরূপ স্যানিটেরিয়মের আলাপী বাবুদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতাম, সেই একদাড়ি নীরস পলিটিকাল আলাপ সর্ব্বপ্রকার সেন্টিমেণ্টস-সন্তাপহারী।

আমার এক অভ্যাস ছিল,—প্রতিদিন বিকালে ট্রেণ আসার সময় ষ্টেসনে গিয়া দার্জ্জিলিঙের নূতন আমদানী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। একগাড়ী লোকের মধ্যে দৈবাৎ দুটি একটি বাঙ্গালীর মুখ চোখে পড়িলে লাগিত ভাল। এখন দার্জ্জিলিঙের সিজন্ আরম্ভ

হইয়াছে। ছোটলাট আসিয়াছেন, পূজার ছুটির দেরী নাই, আজকাল তাই খুব বাঙ্গালী-সমাগম। কালো মুখে হিমালয়-প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এখানকার বাসেন্দা বাঙ্গালীর স্বজাতির মুখ-সন্দর্শন-স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে।

একদিন আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া লোক নামা দেখিতেছি, হঠাৎ একটি মুখ দেখিয়া আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইল। চারুশীলাই ত! তাহার কিছু দূরে অঘোর বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের সঙ্গে আর একটি রমণী ও একটি বালক। আমি আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল, একটি দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারা চলিয়া গেলে স্যানিটেরিয়মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, গৃহে আলো দিয়াছে, আলো সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মাথায় খরবেগে রক্ত বহিতে লাগিল। নিজেকে বার বার একই কথা বুঝাইলাম। আমি ত পলাইয়া-

ছিলাম, অদৃষ্ট আপনি চারুশীলাকে আমার নিকট আনিয়া দিল। এ বিধির নির্ব্বন্ধ, আমি তবে নিশ্চয়ই তাহাকে লাভ করিতে পারিব। সেই রাত্রেই পুনরায় ষ্টেশনে গিয়া কুলিদের নিকট হইতে তাঁহাদের ঠিকানার সন্ধান করিয়া আসিলাম। তাহার পরদিন সকালে অঘোর বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম কুশল-সম্ভাষণাদির পর আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া আমি যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তাঁহার অতিমাত্র বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু তাহা হর্ষযুক্ত নহে, বরঞ্চ ব্যথিত; আমি বুঝিলাম, আমি যে উন্মাদ আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তে তাহা আমায় পরিত্যাগ করিল। তিনি সকরুণভাবে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"বৎস, তোমাকে আমার কঠিন আঘাত দিতে হইবে, তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আর একদিন বিপিনও এমনি বিষণ্নমুখে ফিরিয়া গিয়াছিল।"

তাঁহার স্নেহবাক্যে অতিকষ্টে আমার মুখের স্নায়ুর উপর প্রভুত্ব রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার অনেক দিনের সাধ ছিল, বিপিন আর চারুর বিবাহ দিব। রমেশেরও সেই ইচ্ছা ছিল, বিপিন তাহা জানত। সে বিলেতে থাকতে থাকতে তার পিতার মৃত্যু হয়। সেই জন্যেই বোধ হয়, তার চারুর প্রতি আরও বেশী অনুরাগ হয়। তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে তার হাতে চারুকে স'পে দিতে প্রস্তুত ছিলুম, আমি মূর্খ, তাই এ বিষয়ে চারুর মতামত জানা প্রয়োজন মনে করিনি; কিন্তু বিপিনের উদারতায় চারু চিরজীবনের অসুখবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিপিনের মুখে চারুর উত্তরের মর্ম্ম শুনে আমি বিস্মিত হ'য়ে সরোজকে জানতে বল্লুম, চারু কেন বিপিনকে বিয়ে করতে চায় না। সে জেনে এসে যা বল্লে, তাতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে আর একজনকে ভালবাসে, সে ছেলেটি আমাদের বাড়ীতেই প্রতিপালিত। আমার পৈতৃক নিবাস মজিলপুর।

আমার বাড়ীর পাশে আমাদের স্বজাতীয় একটি দরিদ্র বিধবা ছিলেন, মন্মথ তাঁহারই একমাত্র ছেলে। মন্মথের বারবৎসর বয়সে মার মৃত্যু হ'ল, তার আর কেউ নেই দেখে, আমি স্নেহ-পরবশ হয়ে তাকে আমার বাড়ীতে রেখে আমার ছেলেদের সঙ্গে লেখা-পড়া শেখাতে লাগলুম। তা ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান্ আর সুবোধও বটে, আমাদের ঘরের ছেলের মতই ছিল, চারু আর সে বরাবর একত্রে খেলা করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে চারুর বিয়ে দেওয়ার কথা—আমার কখন স্বপ্নেও মনে আসেনি। সে গরিব, এই বছর খানেক হ'ল, মফঃস্বলে মোক্তারী আরম্ভ করেছে, চারুর যোগ্য বর আমি তাকে মনেই করিনি। বিপিনের সঙ্গে বিয়ে দেব ব'লে, যে রকম সমাজে মিশ্‌বে, আমি তার উপযোগী করেই চারুকে এতদিন শিক্ষা দিয়াছি। চারুর মনের কথা জেনে প্রথমটা আমার বড় আঘাত লেগেছিল; মনে হয়েছিল, এত শিক্ষা—এত যোগ্যতা সব ব্যর্থ; এখন

অন্যরকম বুঝেছি, চারুর সুখে আমার সুখ, জামাইয়ের পদমর্য্যাদায় কি আসে যায়? তারা যখন দুজনে দুজনকে ভালবাসে, তখন বিপিনের সঙ্গে বিয়ে হয়নি, ভালই হয়েছে। আর আমার ত টাকার অভাব নেই, বিয়ে দিয়ে ওকে ব্যারিষ্টারি শিখ্‌তে বিলেত পাঠালেও পারি। যা হোক্, বৎস, আমি কখনও ভাবিনি, চারু তোমারও মনোবেদনার কারণ হবে, যদি তোমার হাতে চারুকে সমর্পণ করা আমার ক্ষমতা-সাধ্য হ'ত, কত আনন্দের সঙ্গে তা কর্ত্তুম, সেইটুকুই শুধু বল্‌তে পারি।"

আমি অল্পক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। চারুর কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে লাগিল।

"কিছুই ত হোল না
সেই সব সেই সব
সেই হাহাকার রব"

নব-বর্ষের স্বপ্ন

পরিষ্কার উজ্জ্বল দিন। আমার নিকট বিশ্ব-ছবি মসীমলিন বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহার পরদিনই কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারুর দুটি ছেলে-মেয়ে, "কিরণ কাকার" দুটি স্কন্ধ দশ শালার বন্দোবস্তে অধিকার করিয়া লইয়াছে, মন্মথ ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছে, প্রতিদিনই তাহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে। বিপিন এখন কলিকাতায়—ডাক্তারীতে তার খুব নাম, আজ দুই বৎসর হইল, সে একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়াছে।

নব-বর্ষের স্বপ্ন আমার জাগ্রত অনুভূতি নহে, আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই, দাম্পত্যের সেই পূর্ব্ব-উপহসিত সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটি, ছোটখাট সুখ-দুঃখও রুচির, তাহা এখন জানি, আমার এই বুভুক্ষায় কঙ্কালসার জীবন অসার, তাহা জানি; কিন্তু তবু বিবাহে প্রবৃত্তি নাই। এ রহস্য পার ত তোমরা উদ্ঘাটন কর। আর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার যে সুখ নাই, তাহাও নহে, সে কথা তোমরা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। শুধু প্রভা যখন আমার শূন্য গৃহের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে, তখন তাহাকে বুঝাইবার অক্ষমতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে।

নূতন ধরণে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার জীবনের ইতিহাস তোমাদের কতদূর বলিয়াছি? বলিয়াছি বুঝি, সেই নব-বর্ষের স্বপ্ন আমাকে কাহিল করিয়া গিয়াছিল, জমিকে কত কলরব করিয়া অঙ্কুরের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল? তাই বটে, সেই নব-বর্ষের স্বপ্নই আমাকে মাটী করিল। একদিন সকালে ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাহিরে একজন ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। সেখানে গিয়া আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ রাম বাবুকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার মুখে ব্যস্ত-

সমস্ত ভাব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রাম বাবু?" তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ভারি বিপদ্, শীঘ্র এস, এই গলির মোড়ে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, একখানা ভাড়াটে গাড়ী উল্টে গেছে, তাতে একটি বার-তের বৎসরের মেয়ে ছিল, আর ঝির কোলে একটি চার পাঁচ বৎসরের ছেলে। ঝি আর ছোট ছেলে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু মেয়েটি বড় আঘাত পেয়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে রয়েছে। শুনছি, আরো দুটো তিনটে গলি পেরিয়ে তাদের বাড়ী, তাই তোমাকে ডাকতে এলুম, তুমি সেখানে দাঁড়াবে চল, আমি তাড়াতাড়ি একখানা পাল্কী ডেকে আনি।"

আমি তাঁহার সহিত চলিলাম। কথিত স্থানে আসিয়া দেখিলাম, একখানা গাড়ী কতক ফুটপাথ, কতক রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে, গাড়োয়ান এই সবে ঘোড়াদের দড়াদড়ি খুলিয়া তাহাদের গাড়ী হইতে ছাড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। স্থানটি নির্জ্জন, তাই শুধু

দুই চারিটি লোক জমিয়াছে, তাহাদের মাঝে একটি অচেতন বালিকা রাস্তার উপর ঝির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ তাহার মুখে জলের ছিটা দিতেছে, কিন্তু চেতনার কোন লক্ষণ নাই। মনে হইল, এ যেন চেনা মুখ। হঠাৎ মনে পড়িল, দুই বৎসর আগে একবার আমার পিতৃব্যের বন্ধু নরেন্দ্র বাবুর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেইখানে তাঁহার কন্যা—এই বালিকাটি আমাদের পরিবেশন করিয়াছিল। তখন বালিকার সরল সুন্দর চঞ্চলভাব বেশ মিষ্ট লাগিয়াছিল। সে দুই বৎসরের কথা, এখন আর সে বালিকা নহে, এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে নবীন যৌবনের আভাস। সে উজ্জ্বল নয়ন এখন নিমীলিত, তাহার সুন্দর মুখে বালিকাসুলভ চপলতা নাই, তাহা এক্ষণে গম্ভীর করুণ-প্রশান্তির শ্রী ধারণ করিয়াছে, একটি বৃন্তচ্যুত কমলের ন্যায় সে পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে পড়িল, তাহার মা নাই, তাহার প্রতি মমতায়,

স্নেহে এবং তাহার সেই মুদিত আঁখি-পল্লবের গাম্ভীর্য্য-শোভায় কতকটা ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। এ সময় ঠিক সে স্বপ্নের কথা মনে করিবার সময় নয়, কিন্তু তবু তাহা মনে পড়িল, সে স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার মুখের সহিত ইহার মুখের কোন সাদৃশ্য থাকুক আর না থাকুক, আমার মনে হইল, এ যেন সেই মুখ, কেবল ভাবের কি প্রভেদ! সে ব্যক্ত প্রেমের লজ্জায় আনন্দে শোভ-মান, আর এ মৃত্যুর পাংশু ছায়ায় লীন; আমাদের মিলন এইরূপে হইবে, কে জানিত?

রাম বাবু পাল্কী লইয়া আসিলেন, আমার চিন্তাস্রোত বন্ধ হইল। আমরা বালিকাকে সন্তর্পণে পাল্কীতে উঠাইয়া তাহাদের গৃহাভিমুখে চলিলাম। গৃহে তাহার পিতা নাই, মফঃস্বলে গিয়াছেন। দুই একদিন পরে ফিরিবার কথা, আমরা তখনই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলাম। সে দিন আমার কলেজে যাওয়া হইল না, কেবল একবারমাত্র বাড়ীতে গিয়া সত্বর

আহার করিয়া আসিয়া রাম বাবুতে আমাতে সমস্ত দিন রোগীর পার্শ্বে রহিলাম। রোগীর চেতনা নাই। সন্ধ্যা-বেলায় তাহার পিতা আসিলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আমার আর সেখানে থাকা অনধিকারচর্চ্চা জানিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিলাম বটে, কিন্তু যেমনটি গিয়াছিলাম, তেমনটিই কি ফিরিলাম? অন্যকে ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়াটা তত সহজ নহে; কাজেই বুঝিলাম, একটু একটু করিয়া আমি অনেকটা হারাইয়া গিয়াছি। বাড়ী আসিয়া কিছুই ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে; সকালে টেনিসনের কবিতাবলী পড়িতেছিলাম, চাকরের কথা শুনিয়া বহিখানি টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি, সেখানি সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। যেখানে যা ছিল, সমস্তই ঠিক-ঠাক আছে; কিন্তু বারো ঘণ্টার মধ্যে আমার মনোরাজ্যেই এক ঘোর বিপ্লব

উপস্থিত হইয়াছে। অন্যমনস্কভাবে একখানা পুস্তক খুলিয়া দুই চারি লাইন পড়িলাম; কিন্তু কিছু অর্থ বোধ-গম্য হইল না। বিরক্তভাবে সেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘরের বাহিরে আসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অনন্ত অন্ধকার তাহার নীরব পক্ষপুটে জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধনেত্রে পড়িয়া আছে, কেবল দূর-আকাশে লক্ষ লক্ষ তারকার স্তিমিত দৃষ্টি, নিকটস্থ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে তাহাদের বিমল শ্বেত জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের জনকোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীর কাছে যে মুদীর দোকান আছে, সেখানে শুধু একজন লোক একটি মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণালোকের কাছে বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছে, আর দশ বারো জন লোক বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে সেই কাহিনী শুনিতেছে। আমি ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া বসিলাম। বাঁধা ঘাটের ধারে একটা ঝিঁঝিঁ তার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নৈশ সঙ্গীতের আখড়া ভারি জমাইয়া লইয়াছিল, আমার পদশব্দে সে সঙ্কুচিত হইয়া তাহার গীতধ্বনি খানিক বন্ধ রাখিল; কিন্তু শীঘ্রই আবার পূর্ণোৎসাহে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বালিকার সেবা করিতে পারিলাম না কেন? আসিবার সময় তাহার চেতনা দেখিয়া আসি নাই, তাহার মুখ তেমন মলিন, তেমনি ক্লিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি; যদি তাহার চেতনা দেখিয়া আসিতে পারিতাম, যদি সেই ধূলিমাখা যূথিকা-কুসুমের ন্যায় নিষ্প্রভ ওষ্ঠে একবিন্দু হাসি দেখিয়া ফিরিতে পারিতাম ত জীবনকে ধন্য মনে করিতাম। আবার মনে হইল, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, তাহার জন্য এত কাতর হই কেন? এই বৃহৎ নগরে ত প্রতিদিনই একটা না-একটা দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। কত অনাথ শিশু মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে; কত অনাথিনী অনাহারে পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে, ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে;

তাহাদের মুখে বিন্দুমাত্র জল দেয়, এমন লোক কেহ নাই, তাহাদের জন্ত ত আমার প্রাণ কাঁদে না। ব্যথা দেখিয়াই যদি আমার এ যাতনা, তবে ব্যক্তিবিশেষের ব্যথাতেই এ রুদ্ধ যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠে কেন? কিন্তু আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিলাম না, শুধু সেই সুন্দর মুখ, নৈশ কমলের ন্যায় অবরুদ্ধ সেই ম্লান নয়ন মনে পড়িতে লাগিল। যদি তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয়! আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সহসা আমার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল; শুনিলাম, আমাদের চাকর উচ্চৈঃস্বরে "ছোটবাবু" "ছোটবাবু" বলিয়া ডাকিতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমি ঘরে ফিরিলাম, ঘড়িতে দেখি, দশটা বাজিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে আহার করিতে বসিলাম, নামমাত্র খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আমার প্রকারে বোধ করি কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কারণ, মা আহারের শেষাশেষি আসিয়া, আমাকে একটু বিষণ্ণ-ভাবে বলিলেন, "তোর কি কোন অসুখ করেছে?" আমি "না" এইমাত্র বলিয়াই উঠিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, শেষ রাত্রে অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল; কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নময়; স্বপ্নেও সেই মলিন মুখ ও নিমীলিত নেত্র দেখিতে পাইলাম। কিন্তু স্বপ্নে সব ঠিক দেখা যায় না, দেখিলাম, ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলিত হইল এবং সেই কাতর নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি আমার মুখের প্রতি প্রসারিত হইল, যেন দুই বিন্দু অশ্রু এবং একটি বিষাদ-কম্পিত নিঃশ্বাস তাহার সাগ্রহ উপহার।

পরদিন প্রভাতে পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য উঠিল, এবং পৃথিবীর প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে সকলই নবীন, সকলই উৎসাহময়, আর আমিই নবীন জীবনে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও কর্ম্মহীন হইয়া পড়িলাম; জীবনের সমস্ত আশা ও সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া সেই পীড়িতা বালিকার কথাই মনে জাগিতে লাগিল। বেলা ৩টার সময় রামবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বলিলেন, "মেয়েটি

অনেক ভাল আছে, তার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করেছ ব'লে নরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রেছেন।" আমি কোন উত্তর না করিয়া এক দিকে প্রস্থান করিলাম।

সাতদিন পরে নরেন্দ্র বাবু আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বেলা ১১ টার সময় আমি আহারার্থ সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমার কাকার বন্ধুর বাড়ী, সেখানে আমার স্বচ্ছন্দ গতিবিধিরই কথা, কিন্তু আমি নিজে কিছু লাজুক শ্রেণীর লোক, তাই চুপে চুপে চোরের মত বাহিরে গিয়া বসিলাম; নরেন্দ্র বাবু তখন একটা ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। আমি উপস্থিত হইতেই সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং মধুর স্বরে বলিলেন, "বাপু, এ তোমাদেরই ঘর-বাড়ী, তোমরা যে সর্ব্বদা আসা-যাওয়া কর না, এই আশ্চর্য্য, তোমরা এখানে আছ, তাই আমি এদের রেখে নির্ভাবনায় বিদেশে থাকি। সে দিন যদি তুমি অত যত্ন না কর্ত্তে, তা হ'লে কি আর লতি বাঁচতো?" আমি ঘাড় নত করিয়া

রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে আহারের জন্য ভিতরে ডাক পড়িল, আমি ও নরেন বাবু আহারে বসিলাম। পরিবেশিকা এবারও পূর্ব্বের মত লতিকা নিজে। পরিবেশনপরায়ণা লতিকার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। অসুখ সারিয়াছে বটে, কিন্তু এক মধুর ক্লান্তিভরে সেই তরুণ দেহযষ্টি আচ্ছন্ন ছিল, প্রবল ঝটিকার পর কোমল বল্লরী যেরূপ ক্লিষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ।

লতিকাকে সঙ্কুচিত হইয়া পরিবেশন করিতে দেখিয়া নরেন বাবু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন,—"তুই এত সঙ্কোচ বোধ কচ্ছিস্ কেন? সুরেশ কি আমাদের পর? সুরেশ না থাকলে যে তোকে আর এ জন্মে দেখ্‌তেই পেতুম না।" তাহার পর আমি কিরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চেতনাহীন দেহপ্রান্তে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, সে সমস্ত ঘটনা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া তিনি লতিকাকে বলিতে লাগিলেন। আমি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না; একটু আস্তে বলিলাম,

"অত প্রশংসার কাজ কিছু করিনি।" লজ্জা ছাড়িয়া লতিকার দিকে চাহিলে বুঝি কৃতজ্ঞতা ও বিনয়মণ্ডিত কুসুম-সুকুমার একটি কোমল মুখ, লজ্জারঞ্জিত দুইখানি প্রফুল্ল কপোল এবং আবেশচঞ্চল কৃষ্ণতার শোভিত নয়নপল্লব আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইত; কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আহারান্তে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম, একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, যদি এই তৃষিত নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি সেই অন্তঃপুরবর্ত্তিনীর সাক্ষাৎ পায়; কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না, বিষণ্ণ-চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রভা আমাদের ভারী বুদ্ধিমতী, সে এক আঁচড়েই মানব-হৃদয়ের বড় বড় গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়া ফেলে; সুতরাং তাহাকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয়। আমার ভয় যে নিতান্ত অমূলক, তাহাও নহে, সে প্রথম হইতেই আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিলাম, আজকাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে আমাকে বিবাহের কথা একটু আঁটাআঁটি করিয়া বলে, এবং আমি ধরা পড়িবার ভয়ে একটু বেশী প্রতিবাদ করিলে সে শুধু হাসে; আমি কিন্তু অত্যন্ত সাহসের সহিত কৃত্রিম দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেও আমার একটা অপ্রতিভের ভাব ঢাকা পড়ে না। আমি বিপদ্ দেখিয়া সম্মুখযুদ্ধে ভঙ্গ দিলাম এবং গ্রীষ্মাবকাশের সুবিধা পাইয়া মুঙ্গের-যাত্রার আয়োজন করিলাম। মুঙ্গেরে আমার ভগ্নীপতি—প্রভার স্বামী চাকরী করিতেন, অনেক দিন হইতেই তিনি আমাকে মুঙ্গেরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন, এবার তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা অতি উচিত বলিয়া বোধ হইল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার আমার সেই পূর্ব্বকথিতা সুরসিকা আত্মীয়ার সহিত দেখা করিলাম। তিনি মৃদুহাস্যে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "আরো দিনকতক না হয় মুক্ত আকাশে গগন-বিহারী পাখীর মত নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়াও, খাঁচা কিন্তু তৈয়ারী হ'তে আর বেশী

বিলম্ব নাই।" দুই একটা সময়োচিত উত্তর ক'রে সহাস্য আস্যে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া নিয়মিত সময়ে গাড়ীতে চড়িলাম, সে সময়ের মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আলোকিত ষ্টেশন, শত শত নরনারী নানা দিগ্দেশে যাত্রা করিতেছে, প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আশা, বিভিন্ন অভিপ্রায়; কে বলিবে, কয় জনের আশা সফল হইবে, আর কত জনের আশা-পূর্ণ হৃদয় ফাটিয়া যে অশ্রু বহিবে, তাহাতে তাহাদের সমস্ত যাতনা নির্ব্বাপিত হইবে না! হায়! প্রত্যহ আমরা কত সুন্দর মুখ, কত প্রেম-পূর্ণ চক্ষু দেখিতে পাই, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তাহার পর তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে অপসারিত হইয়া যায়, সমস্ত জীবনে হয় ত আর তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না; কিন্তু যদি কখনো একখানি মুখ-কমল, দুইটি নলিন-নয়ন হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইয়া প্রাণে এক ঘোর অতৃপ্তি জাগাইয়া অদৃশ্য হয় এবং

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা-পতনের পূর্ব্বে আর দৃষ্টি-পথের মধ্যে না আসে ত উপায় কি? তখন কি আমার এই ভগ্ন-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া অসহায় বিপন্নের ন্যায় প্রেমজ্যোতিহীন এই অন্ধকার-পূর্ণ সংসারসাগরে ডুবিয়া মরিব? ভাবিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না।

মুঙ্গের প্রথম প্রথম বেশ লাগিল, হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনে মনের ভাবও অনেক কমিয়া গেল; সেই রৌদ্রতপ্ত উজ্জ্বল নীলাকাশ, প্রশস্ত প্রান্তর, স্বচ্ছসলিলপূর্ণ প্রবাহিণী, বায়ুহিল্লোলিত দৃঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ শ্যামল বনশ্রেণী ও সুদূর-বিস্তৃত অনুর্ব্বর ধূসর গিরিরাজি, এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈষম্যের মধ্যে নিজের হৃদয়ের ক্ষুদ্র চিন্তা ও অধীর তৃষ্ণা যেন হারাইয়া যায়! এই রকম কতক শান্তি, কতক অশান্তি, কতক চিন্তিত, কতক নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন যোগেশ বাবু (আমার ভগ্নীপতি) বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া

আসিয়া আমাকে বলিলেন, "কি হে, তুমি নাকি ভারী বীরত্ব প্রকাশ করেছ?" আমি একটু বিস্মিতভাবে বলিলাম, "তোমার কথাটা কিছুমাত্র বোধগম্য হোল না।" তিনি বলিলেন, "ইংরেজী কাগজে দেখ্‌লুম, তুমি নরেন্দ্রবাবুর মেয়েকে আসন্ন-মৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচিয়েছ, ব্যাপারটা এতদিন কি বোল্‌তে নেই? যা হোক, কি হয়েছিল, ভেঙ্গে বল দেখি?" আমি একে একে সমস্ত ঘটনাই যথাযথ বিবৃত করিলাম। নরেন্দ্রবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথাটাও বাদ গেল না, এবং কথা-প্রসঙ্গে লতিকার রূপগুণেরও খানিকটা প্রশংসা করিতে ভুলি নাই; কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, শেষের বিষয়টা শীঘ্রই প্রভার কানে উঠিবে ও আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি সংগোপনে পোষিত একটি চিন্তা প্রতিবেশিনী রমণীমণ্ডলীর নিকট একটা প্রীতিকর আন্দোলনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে! বিশেষ আমার সেই বিদ্রূপপরায়ণা ঠাকুরাণী, তাঁহাকেই আমার সর্ব্বা-

পেক্ষা বেশী ভয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর বেশী চিন্তা না করিয়া নীরব ঔদাস্যের সহিত সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

এইরূপ ভাবে দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া তিন মাস কাটিয়া গেল, প্রভাও মুঙ্গেরে আসিয়াছে। একদিন দেখি, সে একখানি চিঠি লইয়া আমার ঘরে আসিতেছে। আসিয়া বলিল, "দাদা, একখানা নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয়াছে বোধ হয়," এই বলিয়া চিঠিখানি আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। কি জানি কেন, আমার অন্তর বিচলিত হইল। পত্রখানি হাতে লইয়া উপরে লাল-কালীতে লিখা আমার নাম দেখিলাম। দেখিলাম, নরেন্দ্র বাবুর হস্তাক্ষর। পত্র খুলিতে ভরসা হইল না। চিঠি-খানা টেবিলের উপর রাখিলাম এবং শুধু ঘুরাইয়া ফিরা-ইয়া শিরোনামটিই বার বার পড়িতে লাগিলাম। মন তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত এবং কি এক বুদ্ধির অগম্য ভাবনা জালে সমাচ্ছন্ন।

ক্রমে পত্রখানি উন্মুক্ত করিলাম। খুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর দুইখণ্ড পত্র—একখানায় নরেন্দ্রবাবু কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অপরখানায় সংক্ষেপে লিখিয়াছেন যে, গত কল্য দৈবাৎ একটি সদ্‌বংশজাত যোগ্য পাত্র পাওয়া গিয়াছে। আর এ মাসে আগামী কল্য ভিন্ন আর শুভদিন নাই বলিয়াই ঐ দিনে তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া সদ্যোনিহত ছাগ-শিশুর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই প্রভা পুনর্ব্বার সেই গৃহে প্রবেশ করিল; আমার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সাম্‌নেই খোলা চিঠি পড়িয়াছিল, চকিতে তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভা আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরই আমি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম। ঘণ্টাকতক অসহ্য যন্ত্রণায় কাটিল। তাহার পর কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে, অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, টেবিলের উপর ডিস্‌রেলির "হেনরিয়েটা টেম্পল" পড়িয়া রহিয়াছে। সেক্ষপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ ও ডিস্‌রেলি প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসলেখকেরা অনেকে নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনেই মন-হারানর কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু হৃদয় বলিয়া একটি পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে ঘোর সন্দেহ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেইজন্য ঐরূপ উপন্যাসে আমার বড় আস্থা ছিল না। এখন বুঝিয়াছিলাম

যে, প্রথম দর্শন কেন, স্বপ্ন-দর্শনেও মনোরাজ্যে একটা গুরুতর গোলযোগ ঘটিতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয়, বইখানা দেখিয়া একবার ইচ্ছা হইল যে, নিজের জীবনের গত তিন চারি মাসের [illegible]না ও চিন্তার সহিত মিলাইয়া দেখি, উপন্যাসলেখক আমার ন্যায় অবস্থাপন্নের মানসিক গতি কতদূর যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। উপন্যাসটি পূর্ব্বে একবার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং সব না পড়িয়া যে যে স্থানে আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল লাগিবার সম্ভাবনা, তাহাই পড়িতে লাগিলাম। একটুখানি পড়িয়াই কিন্তু আর ভাল লাগিল না ; খোলা বই হাতে ধরিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এখন যাহা ঘটিতে বসিয়াছে, তাহাতে আমার ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না, আমার দুঃখের শান্তি হইবে না, আমার মত হতভাগ্য আর সংসারে নাই!

ভাবিতে ভাবিতে লতিকাকে শেষ আর একবার

দেখিবার বাসনা হইল। একবার ভাবিলাম, কেনই বা হৃদয়ের অশান্তি বাড়ান। কিন্তু কিছুতেই এই বৃথা আকাঙ্ক্ষা মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। সেই রাত্রেই কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার অভিলাষ হইতে লাগিল। টাইম-টেবলে দেখিলাম, রাত্রি ১০টার সময় একটা ট্রেণ মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে ১১টার সময় কলিকাতায় পঁহুছে। কিন্তু যোগেশ বাবু ও প্রভাকে কি বলিয়া বিদায় লইব ? বাটী পঁহুছিয়াই বা অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিবার কি কারণ নির্দ্দেশ করিব ? একবার ভাবিলাম, লতিকার বিবাহের নিমন্ত্রণ-রক্ষার ভাণ করিয়া বিদায় লই। কিন্তু মনের ভাব-গোপনের

চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। লতিকাই যে আমার হৃদয়ের অশান্তির কারণ, প্রভা তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। এখন অকস্মাৎ এই রাত্রে ঐরূপ সামান্য কারণে কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিলে, আসল কারণ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন

সন্দেহই থাকিবে না। মানুষের উপহাসাস্পদ হইবার ভয় এতই অধিক যে, লতিকাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সেই ভয়ে কুণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু মনের তোলা-পাড়া কিছুতেই গেল না। যতবার ভাবি যে, "কলিকাতা যাওয়া শ্রেয়ঃ কি না, আর ভাবিব না, না যাওয়াই স্থির", ততবারই আবার তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করি; যেন এখনও কিছু স্থির হয় নাই। এইরূপ অবস্থা অপেক্ষা মনের গুরুতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। ক্রমেই এই অশান্তির গুরুভারে মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারিলাম না। শেষে বুঝিলাম, যতক্ষণ কলিকাতা যাইবার উপায় থাকিবে, যতক্ষণ ১১টা না বাজিবে, যতক্ষণ ট্রেন্ মুঙ্গের ছাড়িয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার ভাগ্যে এই দুঃসহনীয় চিত্তচাঞ্চল্যের বিরাম ঘটিবে না। নিরাশ হইয়া দুই হস্তে মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাহার সহিত কখন বাক্যালাপ হয় নাই এবং যাহাকে জীবনে দুইবারের অধিক দেখি নাই, তাহার জন্য হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা অসম্ভব মনে করিয়া অনেকে হয় ত আমার মনের তৎকালীন অবস্থার এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন; কিন্তু যিনি আমার মত ভুক্তভোগী, তাঁহাকে আমার মনের অবস্থা বুঝাইবার আবশ্যক নাই, আর যিনি এখনও স্বাধীনচিত্ত, এখনও আমার মত জালে পড়েন নাই, তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়াস বিফল হইবে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। একবার উঠিয়া জানালা খুলিলাম। দেখিলাম, আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। একটি ক্ষুদ্রতম তারার মলিন আলোকও দেখা যায় না। আমার বোধ হইল, যেন আমার নবীন জীবনের বর্ত্তমান নৈরাশ্যান্ধকার ও উদ্যম-হীনতা কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা আমাকে বুঝাইবার জন্যই বাহ্য-প্রকৃতি এই ভাব ধারণ করিয়াছেন। এই সময় ঘড়িতে ১১টা বাজিল।

আশা হইল, পরে কপালে যাহাই থাকুক, আপাততঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অসহ্য যাতনা হইতে রক্ষা পাইলাম। পর-মুহূর্ত্তেই কিন্তু আবার গতানুশোচনা কষ্টকর হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, হায়, কেন যাইলাম না, কেন তাহাকে বিবাহ-সভায় শেষ দেখিয়া লইলাম না? মনের ভিতরে ভিতরে একটা দুরাশা-জনিত অনুতাপের সঞ্চার হইতে লাগিল, যেন কলিকাতায় যাইলে কত কি ঘটিতে পারিত। আমি যেন হেলায় হারাইলাম। এখন আর সব নিষ্ফল।

ক্রমে নৈরাশ্যে আমার হৃদয় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে সেই নিস্তব্ধ নৈশগগন-প্রান্তে একটি ক্ষীণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। চমকিয়া উঠিলাম, বিদ্যুদ্-বেগে হৃদয়ে আশা পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড ঝটিকা ও বৃষ্টি আমার ঘরের রুদ্ধ জানালার কপাটে আঘাত করিতে লাগিল। বাহ্য-প্রকৃতির অশান্তি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আমার হৃদয়ের অস্থিরতা ও

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনিশ্চয় অপহৃত হইল। বৃষ্টির স্রোতে, ঝটিকার প্রবল বেগে যেন হৃদয়ের উদ্যমহীনতা ভাসিয়া গেল। তখন আর সংশয় নাই, এখনও উপায় আছে, কলিকাতায় যাইব।

সেই যে ক্ষীণ শব্দ শুনিয়াছিলাম, সে ট্রেণের বাঁশীর শব্দ। ষ্টেশনের নিকটেই আমাদের বাড়ী। অল্প পরেই ট্রেণের শব্দও শুনিলাম, বোধ হইল, যেন ষ্টেশনের নিকট আসিতেছে। বুঝিলাম, ট্রেণ আসিতে আজ বিলম্ব হইয়াছে। জানিতাম যে, মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা থামে। তখন হৃদয়ের বিষম আবেগে আর পূর্ব্বাপর ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না। যাইবার পূর্ব্বে প্রভা ও যোগেশবাবুকে যে বলা আবশ্যক, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। বাটী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। রেলের যে কর্ম্মচারী টিকেট দিতেছিলেন, তিনি আমায় চিনিতেন। টিকেট চাহিবামাত্র তিনি সাতিশয় বিস্মিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া কি বলিলেন। আমার মুখ ও বেশ দেখিয়া বিস্মিত

হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমি তখন এতদূর আত্মবিস্মৃত যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন ও আমি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা কিছুমাত্র স্মরণ নাই। টিকেট লইয়া ট্রেণে উঠিলাম।

অতি শীঘ্রই ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে পূর্ব্ব-মুখে চলিল। ঝড়-বৃষ্টি সমান বেগে চলিতে লাগিল। আমি গাড়ীর একটি মুক্তবাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় বসিয়া রহিলাম।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, মন একেবারে চিন্তাশূন্য থাকিতে পারে না। আমি জানি না, এই সময়ে আমার মনে কোন ভাবনা ছিল কি না, কিন্তু কোন ভাবনা মনের মধ্যে থাকা আমি অনুভব করি নাই। সমস্ত রাত্রি এইরূপ জাগিয়া ঘুমাইয়াছিলাম।

অবশেষে শ্রাবণের ধূসরবসনা উষা পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। সেই প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ সমীরণ-সেবনে আমার মাথায় অনেকগুলি পাগলামি খেয়ালের উদয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হইল। লতিকার সহিত মিলনের নানারূপ অদ্ভুত ও অসম্ভব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু সকলই অতি সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল; তাহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মনে হইয়াছিল, সেটি এই যে, লতিকাকে আমার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া। পাঠক, আপনি হাসিবেন এবং এখন আমিও আপনার সহিত যোগ দিতেছি, কিন্তু সে সময় ইহাতে কিছুমাত্র হাস্যকর দেখিতে পাই নাই। গাড়ী হাওড়ায় আসিল। জনস্রোত পরি-দর্শনের আর আমার তখন প্রবৃত্তি নাই। সমাজ, সাম্রাজ্য ও বাহ্যপ্রকৃতির ঘোরতর বিপ্লবও তখন আমার কাছে কিছুই নয়। আমি বরাবর বাড়ীর দিকে চলিলাম। যাইবার সময় নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গেলাম। বাড়ীতে বিবাহের কোন উদ্যোগ দেখিলাম না, কেন, তাহা ভাবিবার ইচ্ছা হইল না। তথাপি মনে অজ্ঞাতসারে আশার সঞ্চার হইল।

কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভরসা হইল না।

বাটী প্রবেশমাত্র মাকে দেখিতে পাইলাম। মা আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "কি সুরেশ, হঠাৎ না বলিয়া-কহিয়া চলিয়া আসিয়াছ কেন? যোগেশ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে, আমরা ভাবিতেছি। তোমার এরূপ আকার কেন? কি হইয়াছে?" মা'র কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার সেই বৌ-ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন, "কি গগনবিহারী বিহঙ্গম, নিজে পিঞ্জর খুঁজিতে আসিয়াছ? কিন্তু অন্য একটির সন্ধান কর, অভিলষিত পিঞ্জরটি হাত-ছাড়া।" আমি এই অবধি শুনিয়াছিলাম; তাহার পর কি হইয়াছিল, জানি না। কত দিন পর চৈতন্য পাইলাম, জানি না। যখন পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিলাম, তখন আমি শয্যাগত। প্রভা আমার শয্যার কিছু তফাতে বসিয়া আছে। আর বোধ হইল যেন, একখানি পরিচিত মুখ—সে মুখখানি বড়ই মধুর—দ্বারের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল। কিন্তু চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এই মধুর মুখখানি সেই স্বপ্নে দৃষ্ট কিংবা সত্যকার, তাহা তখন স্থির করিতে পারি নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্রমে ক্রমে শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব-ঘটনা অস্পষ্ট স্বপ্নের মত স্মরণ হইতে লাগিল। আমার কি পীড়া হইয়াছিল? আমি কেমন করিয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলাম? সত্যই কি লতিকার বিবাহ হইয়াছে? সত্যই কি লতিকার বিবাহের পত্র নরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম? সত্যই কি সেই রাত্রি—সেই যন্ত্রণাদায়ক রাত্রি আমি রেল-গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম? না, এ সব আমার অসুস্থাবস্থার স্বপ্ন? চিন্তাশক্তির পুনরাগমনে ধীরে ধীরে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ক্রমে সকল কথাই মনে পড়িল। অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থায় সহসা গভীর রাত্রে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসা, আর আসিয়াই সেই বজ্রোপম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংবাদ শুনা, এই সকলই যে আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার হেতু, তাহা বুঝিলাম। বজ্রাঘাত এখন সহিয়া গেল। আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। শুধু একটি নিঃশ্বাস!

শিয়রে প্রভা বসিয়াছিল। রাত্রি-জাগরণে, চিন্তায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুষ্ক ও মলিন। প্রভার এমন মলিন মুখ কখনও দেখি নাই।

প্রভা ধীরে ধীরে আমার কপালে শীতল হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "দাদা!" আমি প্রভার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, প্রভার মুখ বিষণ্ণ ও চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত! আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভা!" আর কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভা!" সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। প্রভা আমার প্রশ্ন বুঝিল, কিন্তু উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখের জানালা খোলা। বাগানের গাছপালা দেখা যাইতেছে। অস্তমান রবির কনক-কিরণ বৃক্ষশিরে

কোমল পত্রে প্রতিভাত। রাস্তা হইতে বালকদের চীৎকারধ্বনি ও গাড়ীর শব্দ কানে আসিতেছে। পৃথিবী চিরতরুণ - চির-আনন্দপূর্ণ। যেমন নদী পূজার পুষ্প বুকে লইয়া—দগ্ধ অস্থি বুকে লইয়া সমান আনন্দে, সমান কলকল-গীতে অবিশ্রাম চলিয়াছে, পৃথিবীও সেইরূপ। আমি কি ভাবিতেছিলাম? প্রভা কেন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল? আমার লতিকা কোথায়? আমার লতিকা? ছি ছি, আমি কি পাগল হইলাম? লতিকার কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে? অবশ্যই হইয়াছে। 'কল্য বিবাহ,' সে বিবাহে কি বাধা হইতে পারে? দূর কর, আর ও সব ভাবিব না; কিন্তু ভাবিব না যত মনে করি, ততই ভাবনা আসে।

সহসা, পর্দ্দার আড়ালে লুক্কায়িত সেই মধুর মুখখানি মনে পড়িল। সে মুখ ত লতিকার ছাড়া আর কারো নয়! লতিকা এখানে কোথা হইতে আসিল? তবে বোধ হয়, আমার স্বপ্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইল, চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল। এমন সময় মা আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। ডাক্তার আমার সহিত বেশী কথা কহিতে, কিংবা আমাকে কথা কওয়াইতে নিষেধ করিয়াছিল। মা নীরবে বসিয়া রহিলেন। শুধু সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, আর ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন আমার হৃদয়ের অনেক ভার কমিয়া গিয়া মন অনেক শান্ত হইল।

রোগের দিন কি দীর্ঘ! কোনমতে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, এ বইখানি ও বইখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া, কখনো জানালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, নানাবিধ অস্থির চিন্তায় আমার দীর্ঘ দিন কাটিয়া যায়। প্রভা কাছে বসিয়া গল্প করে, তাহার কতক বুঝিতে পারি, কতক পারি না। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; কেহ কোন কথা বলেও নাই। আর জিজ্ঞাসাই বা কি করিব?

কত কথাই ভাবি। কখনো খেয়ালে পরিচালিত হইয়া ভাবি, লতিকার বিবাহ হয় নাই। যখনি সন্ধ্যায় একা একা নিতান্ত একাকী থাকি, তখন মনে হয় যদি সহসা আসিয়া লতিকা আমার বিছানার পাশে দাড়ায়! তেমনি মধুর সলজ্জ নম্র শ্রী কাছে আসিয়া যদি দাঁড়ায়! সেই মুখ কত ভাবিলাম, সম্পূর্ণ মনে আনিতে পারিলাম না। তখন কবির এই কয় ছত্র মনে পড়িয়া গেল—

"রূপ খুঁজি পাঁতি পাঁতি, ভাঙ্গি গড়ি দিবারাতি,
তবু ত হয় না ছবি আঁকা।
যে রূপ হৃদয়ে রাজে, ভাবিতে পারি না তা যে,
নয়নে দেয় না সে ত দেখা।
ভাবিয়া পাই না হাসিটুকু
সে হাসি প্রাণে থাকে লেখা॥"

আবার কখনো মনে করি, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

প্রভার চতুর চক্ষু এ সব লক্ষ্য করিত। আর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কেবল স্নেহপূর্ণ-নয়নে আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেন ব্যাকুল হইয়া দেবতার নিকট আমার সুস্থশরীর ভিক্ষা করিত; আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিত।

ক্রমে শরীর সারিয়া আসিল। আমি ঘরের সম্মুখে বারান্দায় একটু একটু বেড়াইতে পারি। কখনো রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্যান-পালক দম্পতির গার্হস্থ্য কলহ দেখি। দেখিয়া হৃদয় ধীরে ধীরে একটু প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বিবাহ-সম্বন্ধে মনে মনে একটা অন্ধ-ভাব গড়িয়া রাখিয়াছিলাম, এখন এই দম্পতি—কলহ ইহাও যেন কত মিষ্ট—কত উপভোগ্য সামগ্রী বলিয়া মনে হয়। মালী-বধূর পালিত পশু সন্তানগণের ইতস্ততঃ বিচরণ ও আহার করিবার সময় পরস্পরের মহাবীরের ন্যায় বলের মর্য্যাদা রক্ষা—ইহাই আমার এখন নিত্য দৃশ্য।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি আমার ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়াছি। অনন্ত নক্ষত্র-খচিত কৃষ্ণাকাশ আমার

চোখের সম্মুখে বিস্তৃত। আকাশ অনন্ত, উদার। আমার জীবনের শেষ কোথা? সীমা কোথা? শুধু দিগ্দিগন্ত-ব্যাপী ছায়াহীন মরুময় শ্মশান-জীবন! আমার কবিত্বের কিছু বাকি রহিল না! বন্ধুবরের সেলিআওড়ান ও হা-হুতাশে আমার অধরপ্রান্তে হাস্যরেখার আবির্ভাব হইয়াছিল। এখন আমার দশা দেখিয়া কে হাসে?

চমকিয়া দেখি, প্রভা আমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জানি না। হয় ত প্রভা আমার পাগলামী কিছু শুনিয়াছে।

প্রভার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে একটা কি বিশেষ কথা বলিতে চায়।

প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা!"

সে কি বলিবে? আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। উত্তর দিতে পারিলাম না।

প্রভা ডাকিল, "দাদা, ও দাদা!" আমি প্রভার মুখের দিকে চাহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"একটা কথা শোন!"

কি কথা বলিবে, আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্রভা বলিল, "দাদা, মা আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি একটি বড় সুন্দরী ক'নে ঠিক করিয়াছেন।" বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি কিছু বলিলাম না। প্রভা বলিতে লাগিল, "বেশ সুন্দর মেয়েটি, আমি দেখেছি, আমার বড় পছন্দ হইয়াছে। এবার আর অমত করো না! লক্ষ্মী ভাই, বিয়ে কর না!"

আমি ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "প্রভা, চুপ কর।" প্রভা চুপ করিল না; বলিল, "আমি মাকে কনের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নাম শুনিবে?"

আমি কেমন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "কি নাম?" প্রভা বলিল, "লতিকা"।

"লতিকা!" বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার মাথার মধ্যে

ঘুরিয়া উঠিল। মাথার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। "লতিকা!" সে কি? আমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছি, নয় ত স্বপ্ন দেখিতেছি।

পর-মুহূর্ত্তেই স্থির হইলাম। মনে করিলাম, লতিকা কি আর কাহারও নাম থাকে না? তাড়াতাড়ি বলিলাম, "সে কোথায়?—কাহার মেয়ে?"

প্রভা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব দেখিতেছিল। একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এই কাছেই, নরেন্দ্র বাবুকে চেন?—তাঁরি মেয়ে। তুমি নাকি একবার তাকে বাঁচিয়েছিলে? তোমার বড় অসুখের সময় নরেন্দ্রবাবু প্রায়ই তোমাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন তাকে সঙ্গে করে এসেছিলেন। বেশ মেয়েটি। আমি মাকে সেই দিনই বলেছিলুম। কিন্তু তোমার তখন ভয়ানক অসুখ, তাই তখন কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই।"

আমার তখন বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু কথাটা ভাল করিয়া আমার হৃদয়ঙ্গম

হইতেছিল না, কেবল সংশয়াকুলিতভাবে এক একবার প্রভার মুখের দিকে চাহিতেছিলাম।

প্রভা আমার প্রশ্ন বুঝল। কথা উল্টিয়া নিয়া বলিল, "তুমি যে দিন হঠাৎ পশ্চিম থেকে চ'লে এলে দাদা, সেই দিন নরেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ বরের অসুখ করায় কিছুদিন বিয়ে স্থগিত থাক্‌বার কথা হয়। এমন সময় পাত্রের বাপের সঙ্গে নরেন্দ্রবাবুর কথায় কথায় মনোবিবাদ হয়, তাই সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। সেখানে লতিকার বিয়ে হ'ল না। তোমারো সেই অবধি অসুখ। তুমি একটু ভাল হ'লে কাকা নরেন্দ্রবাবুকে বলেছিলেন, তাতে নরেন্দ্রবাবু বলেছেন, আমার লতিকাকে সুরেশই বাঁচিয়েছে। নহিলে আর লতিকে বোধ হয় ফিরে পেতুম না। সুরেশের সঙ্গে যদি লতির বিবাহ হয়, তার চেয়ে সুখের কথা কি আছে? আমি প্রথম দিনই এ কথা মনে করিছিলুম, কিন্তু সুরেশ বিবাহ করিতে চায় না, তাই আমি এতদিন কোন কথা বলি নাই।"

কাকা বলেছেন, 'সুরেশ কি আর আমার কথার অবাধ্য হবে ?"

বলিয়া প্রভা আর দাঁড়াইল না, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রভার সেই হাসিটুকু আমার নিতান্ত লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সকালবেলায় যেন শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছে বোধ হইতে লাগিল।

বহু দিন পরে বাগানে বেড়াইতে গেলাম। প্রকাণ্ড জামগাছের ছায়ায় বসিয়া পাঁড়ে ঠাকুর সুর করিয়া তুলসীদাস পড়িতেছেন, আর দ্বারবান্‌বর্গ চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া শুনিতেছে। সাদা সাদা পাগড়ী মস্ত একটি চক্রের আকার ধারণ করিয়াছে। শরৎ-প্রভাতের নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় রৌদ্র-তপ্ত আকাশ,আকাশের দেবতাও তেমনি জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল স্পষ্টানুভূত। আর আমার হৃদয়ের দেবতা এতদিন নিরাশার কুয়াসাবরণে অস্পষ্ট ছিল, আজ আশার আলোকে সেও তেমনি উজ্জ্বল, উত্তপ্ত ও স্পষ্টানুভূত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন খেলার ছলে একটি আমগাছ পুঁতিয়াছিলাম, আজ সেটি কত বড় হইয়াছে। এই পেয়ারাগাছের তলায় আমি ও প্রভা পেয়ারা লইয়া ঝগড়া করিতাম। আজ ছেলেবেলার কত স্মৃতি, কতদিনের কত কথাই মনে উঠিতেছে।

আর একদিনকার কথা আজ মনে পড়িতেছে। সে দিন নববর্ষের স্বপ্নে, সেই প্রথম প্রেম যে মধুর, তাহা জানিলাম। তাহার পর জাগ্রত স্বপ্নে সেই প্রণয়িনীর মুদিত পদ্মের ন্যায় ম্লান অথচ মধুর মুখখানি দেখিলাম।

সেণ্টিমেণ্টালিটীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় আমার পূর্ব্ববন্ধু, উদ্যানপালিকার জীব-শিশুগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিল। তাহাদের মধ্যে দুই চারিটি নূতন প্রাণী বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই সকল পরিবার লইয়া উদ্যানপালকের গৃহলক্ষ্মী আসিয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও নানাবিধ সাদর-সম্ভাষণ করিলেন। পরে বলিলেন, "দাদাবাবুর বিয়ে

নাকি শীগ্‌গির হবে, মাঠাকুরুণের কাছে শুন্‌লাম। আহা, হোক, হোক, বাড়ীতে কচিকাচা নেই, বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে।"

মধ্যাহ্নে আহারের সময় মা আসিয়া প্রফুল্লমুখে সজল-নেত্রে বলিলেন, "ঠাকুরদেবতার কাছে কত মেনেছি বাবা, কত মাথা খুঁড়েছি। আমার ছেলে ছিল, আমি মেয়ে পাব, এই ৬ই অগ্রহায়ণ দিন ঠিক করেছি। আহা, বাছার রঙে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে, কি কাল-রোগই বাছার হয়েছিল।"

প্রভা ঈষৎ হাসিল; কোন কথা বলিল না। তার পর? তার পর আর কি শুনিবে? লতিকার সহিত আমার বিবাহ হইল, সত্য সত্যই লতিকা 'আমার লতিকা' হইল। বৌ-ঠাকরুণের অভিশাপ বা আশীর্ব্বাদ সফল হইল। তবে তাহার রসনাকে আমার বড় ভয়। আমার মত বঙ্গবীর বোধ করি, আর বড় কিছুতে ভয় পান না। বিশেষতঃ এখন তিনি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন। তিনি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন মাঝে মাঝে বলেন—"কেমন বিদ্রূপবাগীশ! এখন আর ঠাট্টা শুনি না কেন?" প্রভা শুধু একটু হাসে আর থাকে থাকে জিজ্ঞাসা করে, "বৌ কেমন দাদা?"

সুন্দর রাত্রি! লতিকার সুন্দর মুখে সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িতেছে। সেই ঢুলু-ঢুলু নবানুরাগ-বিহ্বল সুন্দর নয়ন! নববর্ষের সেই স্বপ্ন, আজ আমার জীবন্ত স্বপ্ন। অপ্রেমিক গর্ব্বিত আমি প্রেমের কাছে আজ শিক্ষা পাইয়া শিখিয়াছি, প্রেম মধুর, প্রেম সুন্দর, প্রেম পবিত্র, প্রেম অবিনশ্বর। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রেমের জয় গাও।

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

সুধীরচন্দ্রের নামটি যেমন ললিত, চেহারাখানিও তদ্রূপ, এবং মনের ভাবগুলিও তদনুরূপ। দিব্যি সুকুমার বাবুটি; সংসারের কঠোর চিন্তার কোন ধার ধারেন না, শুধু ফুলের সৌন্দর্য্য পান করেন, পাখীর গান শোনেন, প্রণয়িনীর মূর্ত্তি হৃদয়ে অনুধ্যান করেন—এবং খবরের কাগজ পড়েন না, ও এই শেষোক্ত ব্যাপারে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করেন। মনে মনে কবি ত অনেকেই; কিন্তু আজকালকার দিনে খবরের কাগজ না পড়ে কটা লোকে? সুতরাং উক্ত কার্য্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিরাগ যে তাঁর মানুষসাধারণের উপর উৎকর্ষের লক্ষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মনে কর, খবরের কাগজে থাকে কি?

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

"পাঠকগণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, গত একপক্ষের মধ্যে সুরুই গ্রামে মারী-ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা দেয় নাই।"

"পদী চাঁড়ালনী শাশুড়ীর নাক কাটিয়াছে, সৌভাগ্য এই যে, কান কাটে নাই।"

"অনেকেই বোধ হয় জানেন না, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, রুসিয়া এখনও ভারতজয়ে সক্ষম হন নাই।"

"গত বুধবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে সহরতলীর মৃত্যুসংখ্যা ৫৫৫॥০ (ভগ্নাংশের কারণ—একজন অর্দ্ধমৃত) এবং ট্রামকোম্পানীর ব্যয়ের সংখ্যা তিনশ তেত্রিশ টাকা সাড়ে তিন আনা তিন ক্রান্তি।"

প্রতি প্রত্যূষে নিয়মিত সময়টিতে এই সকল খুচরা খবরের বুভুক্ষায় সুধীরচন্দ্র অধীর হন না। তিনি জানেন, সে অধীরতা হৃদয়ের ইতরতা প্রকাশ করে। অত পরের খবর রাখিতে গেলে পরকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয়

এবং নিজের প্রতি অবহেলা হয়। নিজেকে নিজের অবিচ্ছিন্ন সুখসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেরই হৃদয়ের দৈন্য স্বীকার করা হয়—সুধীরচন্দ্র তাহা স্বীকার করেন না, সুতরাং খবরের কাগজ পড়েন না, এবং সুবিধা পাইলেই নিজের সম্বন্ধে এ খবরটা প্রচার করেন।

একটি ছোটখাট কবি হওয়ায় মেয়ে-মহলে সুধীরের খুব পসার। শিশুকাল হইতে তাঁহার দিদির শ্বশুরালয়ে তাঁহার যাতায়াত। তাঁহার দেবর-ননদের সহিত নিকটতম আত্মীয়ের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা। স্ত্রীসমাজে মিশিবার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা থাকায় সুধীর পুরাঙ্গনাদের বশ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বল্পকেশী প্রৌঢ়াদের চণ্ডী কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং কখনও বা বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল শুনান এবং নবীনাদের—অপেক্ষাকৃত নবীন কবিদের কাব্যরসে দীক্ষিত করা তাঁহার একটি কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। অপর কর্ত্তব্য—তাঁহার প্রতি ভঙ্গীতে প্রকাশ করা তিনি নিজেই একটি মূর্ত্তিমান্ কাব্য। খবরের কাগজ সম্বন্ধে তাঁহার

বিতৃষ্ণাও মেয়ে-মহলে অবিদিত রাখেন নাই। বেশ গুছাইয়া জুৎসই করিয়া দাঁড় করাইতে পারিলে কথাটা শোনায় ভাল, এবং পুরুষ হইয়াও খবরের কাগজের প্রলোভন সংবরণ করা মেয়েদের নিকট অনেকটা বীরত্বের মত বোধ হয়। অধিকন্তু যখন সে সংবরণের ফলে স্ত্রীসমাজের প্রতি অধিক পক্ষপাতিতা দেখা যায়, তখন তাহা নারীগণের বিশেষ মনোরঞ্জক হয়। তাই সুধীর যে খবরের কাগজ পড়েন না, মেয়েদের নিকট ইহা তাঁহার অশেষ আকর্ষণের একটি। সুধীর তাহা জানেন এবং মনে মনে তাহার জন্য বিশেষ আনন্দিত থাকেন।

কিন্তু মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে বিধাতা পুরুষ তাদের ললাটে যখন ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন, তখন কাহারো ললাটে অবিশ্রাম সুখ লিখেন না, আমাদের সুকুমার সুধীরের ললাটেও লেখেন নাই। সুধীর বেচারা উড়ানি উড়াইয়া, বসন্ত উপভোগ করিয়া, খবরের কাগজ না পড়িয়া বেশ একরকম সুখে জীবন কাটাইয়া দিতে

পারিত, যদি নাকি বিধাতা পুরুষ তাহার জীবনের সুখের পেয়ালায় একটি ফোঁটা অম্লরস ছিটাইয়া না দিতেন।

সুধীরের আয়ত্তগম্য নারী-সমাজের একটি হৃদয়ের প্রতি তাহার আন্তরিক টান—কিন্তু নিষ্ফলতার দৈব লিপি সেইখানেই।

শান্তা তরঙ্গিণীর কনিষ্ঠা ননদ। বয়স তেরর কিছু উর্দ্ধে, দেখিতে আরও ছোট, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় ষোড়শীর সমকক্ষ। সে বুদ্ধি তার মুখশ্রীতে বিভাসিত বটে, কিন্তু নিতান্ত তীক্ষ্ণভাব নয়, সেই সঙ্গে একটি প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্যও সেখানে বিরাজ করিত। সুধীরের অনেকগুলি চালচলনকে শান্তা তেমন আমল দেয় না। স্পষ্ট কিছু প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য সখীদের মত স্পষ্ট স্তুতিবাদের ছল খোঁজে নাই, ইহাতেই সুধীরের বুকে কিছু খট্‌কা বাজে। তাই অন্যত্র তার শতেক পেখম তুলিয়া যতই আস্ফালন করুক, শান্তার সম্মুখে তাহাকে দীন

দেখায়। শান্তার প্রতি প্রেমের কথা তাহার জীবনের প্রধান কথা হইলেও কখনও বলিতে সাহস করে নাই।

কিন্তু সে কথা মুখে বলিতে না পারে, দূরে গেলে তাহা চিঠিতে বলিয়া পোষাইয়া লয়। সুধীর বিদেশে যাইয়া প্রায়ই শান্তাকে চিঠি লেখে। শান্তার চিঠিতে সকলে তাহার কুশল সমাচার অবগত হন। কিন্তু শান্তা তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারে। যে মানুষ সাক্ষাতে বাক্‌চাতুর্য্যহীন, সঙ্কুচিত, লাজুক, কাগজ-কলমে তাহাকে অনেক সময় অসমসাহসিক হইতে দেখা গিয়াছে। চোখে চোখে মিলন নিবারণ করিতে পারিলে অনেক কথা বলা যায়—যাহা চোখের দিকে চেয়ে উচ্চারণ করা অসম্ভব। সুধীর নিজের কলমটি শুধু কালীতে নহে, মাঝে মাঝে নিজের অন্তরেও ডুবাইয়া লিখিয়াছে। এই নূতন উপাদানের একটু বিশেষ মোহ আছে, ইহার গোলাপী আবেশে কলম মধুর বলিয়া থাকে। কিন্তু সে মাধুর্য্য যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত, তাহার গ্রাহ্য নহে। তাই

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

শান্তা নিজের চিঠিতে সুধীরের মধুর প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া যায়। সুধীরও এ পর্য্যন্ত এমন কিছু লেখে নাই—যাহার বিলোপ সহজেই করা না যায়, যে প্রসঙ্গ এড়ান অসম্ভব হয়। শুধু নিজের মনোভাবের আভাষ দিয়াছে মাত্র, তাহার বেশী কখনও অগ্রসর হয় নাই। একদিন একটা উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত্তে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল।

স্বদেশ ও স্বজনের নিকট হইতে একবার একটা দীর্ঘ ছুটি লইয়া সুধীর ভ্রমণে বাহির হইল। অনেক দেশ ঘুরিয়া সিংহলে কলম্বোয় আসিয়া পঁহুছিল। বাঙ্গালা দেশের কোন খোঁজখবর রাখে না, শুধু মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব ও শান্তাকে চিঠি লেখে, এবং তাহাদের নিকট হইতে চিঠি পায়। একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রে সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। একে কলম্বো যেন ছবির দেশ, সমুদ্র, হ্রদ, পর্ব্বত, উপত্যকা, ও কুঞ্জবনে মিলিয়া মিলিয়া সৌন্দর্য্যের শেষ নাই, তাহার উপর সেদিন এমন

একটি রাত যে, সহজেই মানুষকে আত্মবিষণ্ণ করে। সুনীল সমুদ্রের উপর বহুদূর—বহুদূর ধরিয়া নীলাভ রজত-জ্যোৎস্নার বিস্তার। সমুদ্রের বক্ষের উপর দিগন্ত মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশ জলের প্রভেদ নিরূপণ করা যায় না, শুধু উভয় মিলিয়া মানব-হৃদয়ের অনন্তের ধারণা উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাকে কিসের জন্য চঞ্চল করে। তীরে নারিকেলকুঞ্জে কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার—সেই অন্ধকারও সৌম্য, মেদুর। স্বচ্ছ আকাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করিতেছে, এবং স্বচ্ছ অতল জলে অসংখ্য কিরণমালা তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে। সকলের উপরে সমুদ্রের গভীর গম্ভীর কলতান। সেই সঙ্গে কেমন করিয়া শান্তার স্মৃতি মিশিয়া সুধীরের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিল।—"এমন রাতে তারে বলা যায়।" গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শান্তাকে চিঠি লিখিতে বসিল। সুধীরের ন্যায় ভাবুক লোকের হাতে কলম জিনিসটী বিপদজনক। তাহার মনের প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিতে কিছুমাত্র আটক নাই। কখন্ তাহার গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে দয়ার্হ করিয়া তুলিবে বলা যায় না। আজ তাহাই ঘটিল। আজ সমস্ত প্রাণ দিয়া সুধীর তাহার আত্মার নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিল। যে সব আকাঙ্ক্ষা, যে সব ভাবের পীড়ন নিজের কাছেই সব সময় স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না, আজ সেই অসহায় শিশুদের পিতৃগৃহ হইতে পরের দ্বারে স্নেহ খুঁজিতে পাঠাইয়া দিল। চিঠির শেষ ভাগে লিখিল, তুমি এ চিঠি দিনের বেলায় পাইবে, কিন্তু চিঠির উপর আমার অনুরো থাকিবে, যেন সন্ধ্যার আগে না পড়। তুমি যখন পড়িবে, তখন তোমাদের সেখানেও এইরূপ জ্যোৎস্না, তোমাদের ছোট নদীটি ধীরে ধীরে সুন্দর লীলায় বহিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রকৃতিও ভারী মধুর রূপ ধরিয়াছে। এমন রাতে নদীর ধারে বসিয়া একা আমার কথা ভাবিও। যদি কিছু মিষ্টি কথা বলিবার থাকে, আজ আমাকে বল শান্তা, চিরকাল

আমার প্রতি কার্পণ্য করিতেছ, আজ একটিবার মন খোল। বেশী কিছু নয়, শুধু জানাও, আমাকে কিছু স্নেহ কর—আর কিছু নয়।

এতটা আত্মপ্রকাশ সুধীর আগে কখন করে নাই। তাই চিঠিটা ডাকে পাঠাইয়া অবধি মন গুরুভারান্বিত হইয়া রহিল। সুধীরের মনে হইল, জিনিষটা অতি সহজ—বাল্যসঙ্গী তাহাকে জানাইবে কিছু স্নেহ করে। শুধু সেই কথাটি শুনিবার জন্য এত কাতরতা—তার প্রার্থনা পূর্ণ না করাই কম সহজ। আর আরবারের ন্যায় শান্তা যে এবার তাহার এই প্রসঙ্গের বিলোপ করিবে না, এবার সুধীরের স্পষ্ট প্রার্থনায় যে স্পষ্ট উত্তর দিবে, তার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তবু আগ্রহ, সংশয়—শান্তা কি রকমটা করিয়া লিখে? এই চিঠিখানা না লিখিলে সুধীর সকাল সকাল দেশে ফিরিত, কিন্তু ইহা লেখায় ইহার উত্তরের প্রতীক্ষায় আরও কিছুদিন এখানে কাটাইল।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে শান্তার উত্তর আসিল।

আগ্রহাবেগে,-- কম্পমান হৃদয়ে সুধীর তাহা খুলিল। সে চিঠি এইরূপ:—

"সুধীর,

খবরের কাগজে জানিয়া থাকিবে আমাদের দেশে ভারি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে" এইটুক পড়িতেই সুধীরের আত্মাভিমান ক্ষুব্ধ হইল। শান্তা ত জানে যে, সুধীর কখন খবরের কাগজ পড়ে না, এই সুবিদিত ঘটনাটি অম্লান-বদনে না জানার ভাণ করিয়া সুধীরের অনন্যসাধারণত্বকে একেবারে লোপ করিল? যাহা হউক, সুধীর তখনও বুঝিতে পারিল না, এই সামান্য ভূমকম্পের সহিত তাহার পত্রের প্রসঙ্গের কি সংযোগ। অভীষ্ট বিষয়ে শীঘ্র আসিবার জন্য দ্রুত পড়িতে লাগিল। শান্তা লিখিতেছে:—

"শোনা যায়, জাপানের কোন আগ্নেয় গিরিতে বাসুকির গাত্রকণ্ডুয়নেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গাত্রের একটি দোলনি লাগিয়া বাঙ্গালাদেশে ক্রমাগত এক

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

সপ্তাহ ধরিয়া ভয়ানক ভূমিকম্প ছিল। সেই সময় পিতা ভীত হইয়া দেশের পুরাতন, জীর্ণ গৃহ ছাড়িয়া আমাদের কলিকাতা লইয়া আসেন, আমরা এখনও এখানেই আছি। ভূমিকম্প যদি থামিল ত অকাল-বর্ষা। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, তুমি যে রকম দৃশ্য অনুমান করিয়া আমায় সন্ধ্যাবেলায় চিঠি পড়িতে অনুরোধ করিয়াছ সে দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেখানে নদী বহিত, এখন সেখানে ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ; যেখানে চন্দ্রালোকের সম্ভাবনা ছিল, এখন সেখানে ধূসর পাংশু মেঘ। তুমি সেখানে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছ, আর আমাদের এখানে এবার চন্দ্রের আট দশটা কলাই একেবারে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুতরাং তুমি যেরূপ অবস্থায় যেরূপ প্রকৃতির মধ্যে বসিয়া আমায় চিঠি লিখিয়াছ, আমি সেরূপ অনুকূল অবস্থার মধ্যে সে চিঠি পড়িতে পারি নাই। তাই এ চিঠিতে কোন গম্ভীর কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম না, সে জন্য মার্জনা করিও।"

১১৩

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

চিঠি শেষ করিয়া মর্ম্মান্তিক লজ্জায় সুধীর কাঁপিতে লাগিল। কি চিঠির জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতেছি, আর এ কি চিঠি! সে চিঠির কল্পনা এই সমুদ্রোপকূল, এই চিত্রসম ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক সুদৃশ্যকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। কোথায় সে কল্পনার চিঠি, আর কোথায় এ সত্যের, শান্তার স্বহস্তলিখিত নিষ্ঠুর অক্ষরাবলী। একটি অস্বস্তিকর চিন্তা—ক্রমাগত হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল—যদি শুধু খবরের কাগজ পড়িত, যদি শুধু বাঙ্গালা দেশের খবর পড়িত, তবে এমন অসাময়িক প্রসঙ্গে শান্তার এ পত্রনিহিত তীব্র বিদ্রূপের পাত্র হইত না। তাহার মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল-ধরণী তাহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই কাণ্ডটি ঘটাইয়াছে—নহিলে অকস্মাৎ ভূমিকম্প কেন? কে কল্পনা করিতে পারে, সিংহলের সমুদ্রতীরে প্রকৃতি যেদিন এমন মনোমোহিনী, বাঙ্গালার নদীতীরে সে একই সময়—সে এমন চণ্ডী, এমন নিষ্ঠুরা। সুধীরের কানে চিঠির একটি কথা কেবলই

ধ্বনিত হইতে লাগিল—"খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবে।" সমুদ্রের কলতান উপহাস করিয়া বলিল, "হি! হি!! হি!!! খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবে।" বায়ু শীষ দিয়া কানের কাছে বলিল—"হি! হি!! হি!!! হি!!!! খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবে।" বৃক্ষপত্র হেলিয়া-দুলিয়া হাসিতে লুটপাঠ হইয়া বলিল, "হো! হো!! হো!!! হো!!!! সুধীর খবরের কাগজে পড়িয়াছে।" সুধীরের এই বিশ বৎসর জীবনের অগঠিত উপেক্ষিত যত রয়টার্স টেলিগ্রাম যেন পতঙ্গের রূপ ধরিয়া আকাশে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। সুধীর লজ্জা লুকাইবার ঠাঁই দেখিল না। সে যে শান্তাকে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহার প্রত্যেক কথা স্মরণে উদয় হইল। হৃদয় একেবারে অনাবৃত নগ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিল—এই অভ্যর্থনার জন্য লজ্জা দুঃখ মন্থন করিয়া দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু বালুতে মিশাইল এবং সেই সঙ্গে একটি প্রতিজ্ঞার অভিষেক হইল।

*   *   *   *   *   *

খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম

"আলোক" বেশী দিন এ পৃথিবীর আলোক দেখে নাই। সবে ছয় বৎসর আগে সে সংবাদপত্রেও জগতে তাহার নয়ন উন্মীলন করে। কিন্তু ইহারই মধ্যে সম্পাদকের নাম মুখে মুখে; এমন বিজ্ঞ, এমন সুযোগ্য সম্পাদক ক্বচিৎ দেখা যায়। তাঁহার "আলোক" দেশময় আলোক ও শিক্ষা বিকীর্ণ করিতেছে, সর্ব্বত্র তাহার জয়পতাকা উড্ডীন। কিন্তু আমরা যদি সম্পাদকের গৃহে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিতাম, বোধ করি দেখিতাম, আনন্দ বা গর্ব্বের পরিবর্ত্তে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রভাতে প্রথম কাগজখানি হাতে করিয়া দেখিবার উপক্রমকালে যেন একটা তীব্র লজ্জা ও বেদনা-রাগে তাঁহার সৌম্যমুখ রঞ্জিত হইয়া যাইত।

শাস্তা কোথায়? সুধীরের জীবনের সম্পূর্ণ বাহিরে। যাহার বিদ্রূপ-কশাঘাতে সুধীরের মধ্যে যাহা কিছু মিথ্যা ও ভাণ সর্পের নির্ম্মোকের ন্যায় সিংহলের সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, যাহার নিকট নিজের যোগ্যতা

প্রমাণ করিবার জন্য সে রাত্রে তাহার মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—তাহার মতামত জানিবার এখন আর উপায় নাই, এবং তার জন্য সুধীর এখন উতলাও নহে। তথাপি এখনও মাঝে মাঝে কোন একদিন সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যে ঘোরতর নিমজ্জনকালে পূর্ব্ব-কাহিনী হঠাৎ যেন চোখের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হয়,—এবং মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে বিকল করে। সহকারী প্রভুর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার চিত্তের গোলযোগ সন্দেহ করে।

সুরেশের উপহার

ঐ টেবিলের উপর একখানি পুরাণ ব্লটিংবুক পড়িয়া আছে দেখিতেছ? এখনও উহা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হয় নাই। এখনও উহার চাম্‌ড়া খুব মজ্‌বুং আছে, সোণালি ছাপান ফুল প্রায় আগেকারই মত চক্‌চকে রহিয়াছে। কেবল মলিন মলাটের উপর চিত্র বিচিত্র ছবি, হিজিবিজি ও বড় বড় কালীর ফোঁটা। একটী জায়গায় পরিষ্কার ছোট ছোট অক্ষরে কোণাকুণি লেখা রহিয়াছে "বন্ধুবর"। সব হিজিবিজি সব কালীর দাগের মধ্য হইতেও ইহা চোখে পড়িতেছে—অন্ততঃ সকলের না হউক এক জনের। আলিপুরের "ফ্যান্সি বাজারে" রাশীকৃত সুন্দর মূল্যবান জিনিষের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই একটী সামান্য জিনিষ সুরেশ কিনিয়া আনিয়াছিল। সুরেশ যখন সবে

সুরেশের উপহার

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছে তখন মন্মথ বি-এ পড়ে। তখন মন্মথের মত প্রতিভাশালী ছাত্র সে স্কুলে আর ছিল না। তার প্রতিভার কিরণে শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল, তার গৌরবে সমস্ত স্কুলের গৌরব। এখন কল্পনাই করিতে পার, অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর বালকদের হৃদয়ে মন্মথের প্রতিভা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মন্মথ প্রায় কাহাকেও জানে না, কিন্তু মন্মথকে সকলেই বিশেষরূপে জানে। তাহার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে অনেক বালক আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিত; অথচ স্কুলে আপনা হইতে গিয়া একজন বয়স্ক ছাত্রের সহিত আলাপ করা একজন ছোট বালকের পক্ষে অসম সাহসিকতা, সুতরাং ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় ও সঙ্কোচে কেহ অগ্রসর হইত না। তাই মনে মনে মন্মথের প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ থাকিলেও সুরেশের তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা অনেক দিন অসম্পূর্ণ ছিল। একদিন দৈবক্রমে তাহা ঘটিয়া গেল। সুরেশের ভগিনীর বিবাহে অন্যান্য বর-যাত্রীর সহিত মন্মথ

তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। বালক সুরেশ অনেকটা আগ্রহ ও আনন্দ এবং কতকটা লজ্জার সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। সে রাত্রি সমস্তক্ষণ সে মন্মথের পাশে রহিল। স্কুলের সকলে তাহাকে কিরূপ সম্মান ও ভক্তি করে তাহা মুখে চোখে ও সলজ্জ কথা-বার্ত্তায় অল্পে অল্পে সব গল্প করিল। মন্মথের আত্মম্ভরিতা তেমন বেশী ছিল না। তাই বালকদের মহাপুরুষ-ভক্তি তাহার উপর দিয়া চরিতার্থ হইতেছে জানিয়া একটু কৌতুক-জনক মনে হইল, একটু হাসি আসিল, আর এই সাগ্রহ, হৃদয়বান্ সমুজ্জ্বল বালকের প্রতি সেও আকৃষ্ট হইল। যাইবার সময় সুরেশকে একদিন তাহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। এই তাহাদের বন্ধুতার সূত্রপাত। সুরেশ মন্মথের অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট —তবুও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। পাঁচ বৎসর পরে যখন মন্মথ ছাত্র জীবন শেষ করিয়া কাজের জীবন গ্রহণ করিল, এবং সুরেশ এণ্ট্রেন্স পাশ

করিয়া ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতে লাগিল তখনও তাহাদের এ বন্ধুতার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন; তবে এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে—এক পক্ষ দেয়, আর এক পক্ষ গ্রহণ করে—এক পক্ষ তন্ময়, অপর পক্ষ প্রশান্ত—এক পক্ষে গাঁট দৃঢ়, অপর পক্ষে শিথিল;—তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভাবের একটু বৈলক্ষণ্য আছে। মন্মথ একজন বড় লোক, তাহার দেশব্যাপী খ্যাতি, তাহার গৃহে লোক সমাগমের বিরাম নাই। আর সুরেশ একজন সামান্য স্কুলের ছাত্র। পতঙ্গ যেমন আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, স্কুলের ছাত্রেরা তেমন বড়লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মন্মথ-আলোককে এমন অনেকগুলি বালক-পতঙ্গে ঘিরিয়াছিল। সুরেশ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ মাত্র। যে তোমার শ্রদ্ধার পাত্র তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় আসিয়াও যদি তাহাকে শ্রদ্ধার অযোগ্য মনে না হয়, তবে সে শ্রদ্ধা কালক্রমে প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে। সুরেশেরও তাহাই হইয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরের বন্ধুত্বে

সুরেশের উপহার

মন্মথের প্রতি তার একটা গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল, বালক-হৃদয়ের প্রথম অনুরাগ ভারি হৃদয়-স্পর্শী, কেন না পাত্রাপাত্র বিচার শূন্য, যথাযথ পরিমাণ জ্ঞান-বর্জ্জিত, অতএব অনেকখানি নিষ্ফলতার অভিশাপ জড়িত। মন্মথ বাস্তবিকই সুরেশের হিতাকাঙ্ক্ষী—এবং তার প্রতি স্নেহশীলও ছিল, কতদিন সেই অপরিণত বুদ্ধি বালককে সস্নেহে উচিত পরামর্শ দিয়া তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছে। তবে মন্মথ যেমন সুরেশের একমাত্র বন্ধু, সুরেশ তেমন মন্মথের একমাত্র বন্ধু নয়। তার মতন বালক বন্ধু মন্মথের আরো দু'চারটী ছিল; তা'ছাড়া সমবুদ্ধি বয়স্ক বন্ধুরও অভাব ছিল না। সুতরাং সুরেশ মন্মথের নিকট যতটা প্রত্যাশা করিত, মন্মথ কোন মতেই ততটা দিয়া উঠিতে পারিত না। মন্মথের এত কাজ, এত লেখা, এত বক্তৃতা, এত মিটিং, এত দর্শনপ্রার্থীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর হইত না। সুরেশের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য না থাকিলেও

তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইয়া পড়িত। এ অবহেলা যে সুরেশের মনে বাজিত না এমন নহে, তবে তাহাতে নিজের অনুরাগ, আকর্ষণ কিছুই কমিত না। তার নবীন জীবনের, নবীন উৎসাহ উদ্যমবলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাংশগুলি চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ করিয়া সংক্ষিপ্ত পকেট এডিশন বানাইয়া সে মন্মথের জীবনের ভিতর পূরিয়া দিয়াছিল। মন্মথের জীবন হইতে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। একশত সহপাঠী ছিল তবু তাহাদের সহিত না মিশিয়া মন্মথের সহিত গল্প করিতেই ভালবাসিত। মন্মথের লাইব্রেরীভরা বই, তবুও কোন নূতন ভাল বাঁধান মন্মথের মনের মতন বই দেখিলে সুরেশ তাহার জলপানীর টাকা দিয়া সে বইখানি বন্ধুর জন্য উপহার লইয়া আসিত। অনেক সময় মন্মথের সে গ্রন্থের দু এক পাতের বেশী উল্টিয়া দেখিবার সময় হইত না, লাইব্রেরীতে অযত্নে পড়িয়া থাকিত, সুরেশ তাহা জানিত, তবুও তাহাকে উপহার দিবার আনন্দ-টুকুই যথেষ্ট মনে করিত।

সুরেশের উপহার

এক বছর সুরেশের পাড়ার ছেলেরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরে মিসনারি মেমদের "ফ্যান্সি বাজারে" যাইল। লুব্ধ নয়নে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরেশের মনে হইল মন্মথের কি ভাল লাগিবে, না জানি কোন্ জিনিষ তার নিশিদিন ব্যবহারে আসিবে, খুঁজিতে খুঁজতে এই ব্লটিংবুকটী চোখে পড়িল। তখন এই খাতাখানি কিনিয়া বাড়ী আসিয়া, মলাটের উপর বাঁকোণে পরিষ্কার অক্ষরে কোণাকুণি করিয়া ষ্টিফেনের ব্লুব্লাক কালী ও বালক-হৃদয়ের অনেকখানি ভালবাসা ও মিষ্টত্ব দিয়া লিখিল—"বন্ধুবর।" মন্মথ বাবু এক বৎসর এই খাতাখানি ব্যবহার করিলেন, এক বৎসর পরে ইহার মলাটটা একটু মলিন হইয়া আসিল। তখন মন্মথের গৃহ নূতন করিয়া সজ্জিত হইতেছে। দেয়ালে নূতন পেণ্ট্ লাগিয়াছে, মেঝেতে নূতন কার্পেট পড়িয়াছে, গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ নূতন কৌচ, নূতন কেদারা, নূতন ডেস্ক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সব নূতন উজ্জ্বল আসবাবের

সহিত পুরাণ মলিন ব্লটিংবুক আর খাপ খায় না। অতএব বাবুদের সরকার একদিন বুদ্ধি করিয়া একটি নূতন, বহুমূল্য সুন্দর ব্লটিংবুক কিনিয়া আনিয়া নিবেদন করিল, "মেজবাবু মহাশয়ের ঘরে সবই নূতন জিনিষপত্তর, কেবল ঐ খাতাখানাই যা পুরোণ, তাই চীনেবাজার দিয়ে আস্‌ছিলেম্, মনে কর্‌লেম্ একখানা ভাল দেখে কিনে নিয়ে যাই, বাবুর কি এখানা পছন্দ হয়?" তখন সুরেশ সে ঘরে উপস্থিত ছিল। মন্মথ ডেস্কের সাম্‌নে বসিয়া একটা বক্তৃতা রচনার মাঝামাঝি ঘোর চিন্তামগ্ন। সুরেশ তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে একটা কৌচে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় মিলের লজিকে নিবিষ্টচিত্ত। সরকারের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিবা মাত্র সুরেশ সিধা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহে মন্মথের উত্তর প্রতিক্ষা করিয়া রহিল। মন্মথ নূতন ব্লটিংবুকখানি একবার দেখিয়া, পুরাণখানি আর একবার দেখিয়া, আপনার হস্তস্থিত কলমের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হ্যাঁ, এটা ময়লা হয়েছে বটে, তা

নূতনটা এনেছ বেশ করেছ, রেখে যাও।” এই বলিয়া পুনর্ব্বার লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরেশ বুঝিল মন্মথ তাহার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলিয়া গিয়াছে যে খাতাখানি সুরেশের উপহার। সে ব্লটিংবুক কেবল ব্লটিংবুক মাত্র—আর কিছু নয়—কাহারও উপহার কিনা সে কথা ভাবিতে মনে পড়িল না—ব্যবহার্য্য কি অব্যব-হার্য্য তাই শুধু মনে হইল। বালক-হৃদয় ভেদ করিয়া একটি ছোট চাপা নিঃশ্বাস উঠিল। সে মিনিট দুই তিন মাথা নামাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ মন্মথের পশ্চাতে বসিয়াছিল তাই মন্মথ কিছু জানিল না। তাহার দিনকতক পরে সুরেশ আবার মন্মথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তখনও বেলা হয় নাই, মন্মথবাবু তখনও অন্তঃপুর হইতে এ গৃহে আসেন নাই। সুরেশের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহার

ডেস্কের প্রতি চোখ পড়িল। দেখিল নূতন খাতা এখনও ব্যবহৃত হয় নাই, ডেস্কের একপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, পুরাণখানি যথাস্থানে আছে। মন্মথ গৃহে আসিতে কি কথা কহিবে মনে করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনার নূতন ব্লটিং এখনও ব্যবহার করেন নি?" এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিতে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল অথচ গোড়ায় ঐ কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মন্মথ ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া দুটো নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "হাঁ্যা করব, কিন্তু পুরোণটার সঙ্গে বেশ একরকম বনিবনাও হয়ে গেছে, অনেক দিন ধরে এইটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সহসা আর নূতনটার সঙ্গে কারবার কর্ত্তে ইচ্ছে করে না, আচ্ছা আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক্।" এই বলিয়া পুরাণ খাতা হইতে কাগজ পত্র বাহির করিয়া নূতন খাতায় পূরিল। পুরাণ খাতা গৃহ-কোণে ফেলিয়া রাখিল। সুরেশের মনে হইল তার ভালবাসা

গৃহকোণে অনাদরে গড়াগড়ি গেল। একবার ইচ্ছা হইল সে খাতাখানি তুলিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া যায়। কিন্তু মন্মথবাবু কি ভাবিবেন? সুরেশের আগ্রহ দেখিলে তাঁর মনে পড়িবে এ সুরেশের উপহার—তার হৃদয় বেদনা বুঝিতে পারিবেন, সে কত লজ্জা করিবে। খাতা উঠান হইল না। সুরেশ শেল্‌ফ্‌ হইতে একখানা বই পাড়িয়া বসিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার দিনকতক পরে মন্মথ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সে খাতাখানির উদ্ধার করিল। তাহারা দেখিল, মেজ-দাদার ডেস্কের উপর একখানি চকচকে নূতন খাতা বিরাজ করিতেছে, গৃহকোণে পুরাণখানা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বিচার করিল, এখানি অগ্রজের পরিত্যক্ত, অত-এব তাহাদের ভোগে আসিবার অবস্থা প্রাপ্ত। তাহার পরদিন হইতে খোকাবাবুদের পাঠ-গৃহের টেবিলে সে খাতাখানির অধিষ্ঠান হইল। মন্মথবাবুর দুই শ্যালক, দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতায় মিলিয়া সুরেশের

উপহার দখল করিল। তখন মলাটের উপর বিচিত্র ছবি চিত্রিত হইল, এবং মসীরেখায় সুরেশের হস্তাক্ষর প্রায় ঢাকা পড়িল। সুরেশ যতবার মন্মথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, ততবার আগেই এ খাতাখানি চোখে পড়ে। ততবারই মনে করে, "মন্মথবাবু যখন এ ঘর দিয়ে যান, তখন কি তাঁর একবারও মনে পড়ে না যে, এ খাতাখানি আমার উপহার? একটু বোধ হয়, স্নেহের সঙ্গে দেখেন, একবার বোধ হয়, দাঁড়াইয়া ভাবেন, ঐ ক্ষুদ্র 'বন্ধুবরের' ভিতর কতখানি ভালবাসা নিহিত রয়েছে। হা মুগ্ধ ভ্রান্ত বালক! তুমি নিজের হৃদয়ের কথা বন্ধুতে অর্পণ করিতেছ। প্রবল প্রমাণকেও দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া মিথ্যা আশার সুখ তোমার হৃদয়ের পদবী লাভ করিতে চাহে। তুমি বুঝিতে পার না, যে উপহার দ্রব্য তোমার পক্ষে গভীর অর্থপূর্ণ—হৃদয়-ব্যঞ্জক, তোমার খ্যাতনামা, অনবসর বন্ধুর পক্ষে তাহা কেমন করিয়া একেবারে অর্থহীন—শূন্য-ব্যঞ্জক। চিরদিন এই

চলিয়া আসিতেছে, উপহারের দ্রব্যটির সঙ্গে কতখানি হৃদয় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা যে উপহার গ্রহণ করে, তাহার মনে থাকে না, যে উপহার দেয়, তাহার মনে থাকে! তাই গ্রহীতার পক্ষে দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপহারত্বটুকুও নষ্ট হইয়া যায়; দাতার চোখে সে হৃদয়-বিমিশ্রিত দ্রব্যও চিরদিন অবিনশ্বর।

বাঁশী

১

"ঠাকুরজামাই, আমরা কোথায় যাচ্ছি? এ কি আমাদের গ্রামের পথ? না! এ যে রাজ-মহালের রাস্তা, ঐ সব পাহাড়, রাস্তার একপাশে খদ, এত দূরে কেন এসে পড়লুম?"

জীবন চুপ করিয়া রহিল। সুহাসিনী কুতূহলী নেত্রে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে গাঢ়বর্ণে কি লিখিত দেখিল, একটা ভয় ও সন্দেহে তাহার হৃদয় অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হইল। ফাঁদে পড়া হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত চঞ্চল লোচনে, কাতরস্বরে বলিল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জীবন, বাড়ী কোথা?"

জীবন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ পাহাড় দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওর তলায় গাড়ী থাম্‌বে, ঐ পাহাড়ের উপর যে ছোট্ট বাড়ীটি রয়েছে ঐ আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "সে কি, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"তবে শোন"—জীবনের স্বর আবেগের আধিক্য প্রযুক্ত ঘনশ্বাস-জড়িত—"সুহাসিনী, তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, জীবন-সর্ব্বস্ব, এতদিন অতি কষ্টে আমি নিজেকে সংবরণ ক'রে রেখেছিলুম; আর না, দৈব এতদিনে আমার সহায় হয়েছে। তোমার যখন পিতৃগৃহে গিয়ে তোমায় আন্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেম, প্রভাষ অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্মতি দিলে। আমি সেখানে যাত্রা করার পূর্ব্বে এখানে এসে এই বাড়ী ঠিক ক'রে গিয়েছি, এ স্থান আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। প্রিয়তমে, এই গৃহে তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হয়ে অধিষ্ঠান কর্‌বে।"

সুহাসিনী স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিল, "জীবন মুগ্ধ! তুমি কি বলছ! বাড়ী ফিরে চল, সেখানে শান্তি তোমার পথ চেয়ে রয়েছে।"

"আর না সুহাসিনী, সে বাড়ী আর না, এখন হ'তে এই আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল, "ফিরে চল, ফিরে চল ভাই, আমি তোমার শরণাপন্ন ভগিনী, আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে এস, তিনি বিশ্বাস ক'রে তোমায় পাঠিয়েছেন, আমাদের পথ চেয়ে রয়েছেন, বিলম্ব দেখে কত চিন্তিত হচ্ছেন, তাঁর বিশ্বাস রাখো, রাখো।"

জীবন মৌন, তাহার সংকল্প অবিচলিত। গাড়ী ক্রমেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুহাসিনী জীবনের পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল;—গাড়ী খদের পাশ দিয়া চলিতেছে,—একবার এক দৃষ্টিপাতে খদের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া লইল. তার পরে আর

ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। জীবন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া চকিতে তাহার সহিত মাটীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, দু'জনে আলিঙ্গণবদ্ধ হইয়া খদে গড়াইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানের আহ্বানে গ্রামস্থ লোক তথায় জড় হইয়া তাদের উঠাইল, দুজনেই সংজ্ঞাহীন, আহত, রক্তা-প্লুত-দেহ। দু' চারি দিন পরে সুহাসিনীর সংজ্ঞালাভ হইলে তাহার কথিত ঠিকানায় প্রভাষকে সংবাদ পাঠান হইল। জীবন বেশী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখনও ভালরূপ চেতনাসঞ্চার হয় নাই। প্রভাষ তাহাদের সন্তর্পণে পাল্কীতে উঠাইয়া বাড়ী লইয়া গেল। কিরূপে এই অস্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা তখন জানিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া জীবনের জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র সে প্রভাষকে তাহার শয্যার পার্শ্বে ডাকিয়া পাঠাইয়া সব বলিল, কিছু গোপন করিল না।

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি প্রভাষের মমতার উৎস রুদ্ধ হইল, সে শুষ্ক অন্তঃকরণে কঠিন-হৃদয়ে সুহাসিনীর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে ফিরিয়া গেল।

বাঁশী

২

দিবালোক-বর্জ্জিত অন্ধকার গৃহে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তি সুহাসিনীর শয্যার পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে; শিয়রে প্রভাষ স্থির-পুত্তলিকা-প্রতিম। তাহার চক্ষে অশ্রু নাই; যাহার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইতেছে, তাহার প্রতি করুণার লেশহীন নীরস তীব্র ক্রোধে হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।—কিন্তু তাহার ক্রোধের পাত্রও তখন নিম্ন গৃহে মৃত্যুশয্যায় শয়ান।

সুহাসিনী একবার চক্ষু মেলিল, জ্যোৎস্নার আলোকে প্রভাষের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল, "জীবনকে ক্ষমা করো।"

শান্তি এই কারুণবাক্যে কৃতজ্ঞতাভরে শয্যাপ্রান্ত হইতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাষের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, শুধু সুহাসিনীর ক্লান্ত অধরের শেষ

আহ্বান বুঝিল। তাহার অন্তিম চুম্বন লইয়া দীর্ণ-হৃদয়ে তাহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে শান্তি প্রভাষকে সে গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিল।

গভীর রাত্রে, বহু কষ্টে আপনার অবশ দেহভার কোন মতে টানিয়া আনিয়া একজন হতভাগ্য চিরনিদ্রিতা সুহাসিনীর চরণ-কমল অশ্রুজলে ধৌত করিয়া, মনে মনে সেই দেবীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া, পুনর্ব্বার বহু আয়াসে ধীরে ধীরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

জীবনের মৃত্যুশয্যা। শুধু শান্তি তার পাশে বসিয়া রহিয়াছে, সে গৃহে আর কেহ নাই। বিষণ্ণ, ক্ষীণকণ্ঠে জীবন বলিল, "আর ত দেরী নাই শান্তি, একবার তোমার দাদাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।"

জীবনের আহ্বানে প্রভাষ আসিল, আসিয়া শয্যা হইতে কিছু তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বলিল, "শেষবার—তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্ছি প্রভাষ, জন্মের মত বিদায়, এখনও কি একবার স্নেহালিঙ্গন দিবে না?"

প্রভাষ কিছুই কহিল না। নিরুত্তরে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন ব্যথিত-হৃদয়ে শ্রান্ত-দেহ দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "আমি মার্জ্জনার

যোগ্য নহি ঠিক ; অতি সহনাতীত অন্যায় করিয়াছি ; তাই হউক ; এ শাস্তি আমার বহনীয়।”

আর এক মুহূর্ত্তেই সব ফুরাইল। একটা মস্ত বড় গভীর বেদনা আজ জীবনের মৃত-মুখে ছাপ রাখিয়া গেল।

৪

শুক্লপক্ষ ; আকাশ মেঘলা ; প্রবল ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। দুঃখী হউক, সুখী হউক, এত বাতাস সকলের মনকেই একটু বিক্ষিপ্ত করে, তাহাদের স্ব স্ব চিন্তাভার হইতে ঈষৎ ইতস্ততঃ উড়াইয়া লইয়া যায়। আজ যদি প্রথম বসন্তের সুশোভন মধুরিমাময় জ্যোৎস্না-রাত্রি হইত তাহা হইলে শান্তির হৃদয় এখনও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আজকার ঝোড়ো প্রকৃতির সঙ্গলাভে তাহার মন ঈষৎ শিথিল হইয়াছে। পীড়িত নিরাবলম্বন হৃদয়ের প্রকৃতির দুরন্তপনা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কতকটা আশ্রয় সান্ত্বনা,—অবলম্বন আছে। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহকোণ হইতে বহুদিনের অনাদৃত সেতারটা লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিল।

তাহার তারের ঝঙ্কার উপরের গৃহে তাহার ভ্রাতার কানে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।

বৃহৎ পুরীর দুই বিভিন্ন তলার দুটি কক্ষে দুই ভাই-বোনের বাস। ইহাদের পৃথিবীতে আর কেহ নাই; অথচ দুঃখের দিন ইহাদের পরস্পরকে হৃদয়ে আরও একটু কাছাকাছি টানে নাই—বিস্তর তফাৎ করিয়া দিয়াছে। হৃদয়ের ব্রণস্থানে পরস্পরের সহানুভূতির স্পর্শ হইতেই উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। যে গৃহে আগে প্রেমের রাজত্ব ছিল, যেখানে হাসি, গান, প্রীতি কারণে অকারণে নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, আজ তাহা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, চিরপ্রেমবিরহিত। ইহাদের অন্তরে মিল আছে, দুজনের দুঃখে দুজনে মনে মনে ব্যথিত হয়, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

প্রভাষ একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাঁশী বাজায়,

তার বাঁশীর বিলাপ শান্তির হৃদয় স্পর্শ করে, ভ্রাতার দুঃখে তাহার শিরায় শিরায় দুঃখ-প্রবাহ সঞ্চরণ করিতে থাকে, কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথা কহিতে আসে না, কোন স্নেহবাক্য বলে না, শুধু বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া প্রভাষের জন্য কাঁদে, বাঁশীর বিরামের জন্য কান পাতিয়া থাকে।

যখন আর বাঁশীর শব্দ কানে আসে না, তখন জানে, সে রাত্রির মত প্রভাষ শান্ত হইল, সুহাসিনীর আবাহন সমাপ্ত হইল, দুঃখের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হইল —হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে! তখনকার প্রত্যেক দিনটা কি মাধুরীপ্লুত, কি শোভাময়, কি মধুময়। কি সহজ আনন্দে চারিটি তরুণ হৃদয়ের জীবন-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। মাঝ হইতে কুটিল লালসা কোথা হইতে আসিয়া সব ভণ্ডুল করিল, জীবনের মরণ-কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? শান্তি কি বুঝে না, প্রভাষের প্রতি জীবন কতদূর অপরাধী? স্বামীর অপরাধে

ভ্রাতাকে দুঃখী জানিয়াই ত দ্বিগুণ দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তিমশয্যায় অনুতপ্ত ক্ষমাভিখারী স্বামীর প্রতি ভ্রাতার কাঠিন্য যখন স্মরণ হয়, সেই বেদনা-ক্লিষ্ট মৃত মুখখানি যখন মনে পড়ে, তখন তাহারও হৃদয় বড় কাঠিন্যে পূর্ণ হয়, আর প্রভাষের নিকট স্বামীর অপরাধের জন্য অতীত সুখ-দিবসের জন্য কাঁদা হয় না, নিজের দুঃখ সান্ত্বনা নিজের অন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রভাষ শান্তির নিরানন্দ শূন্য-হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়, কিন্তু তাহাকে জীবনের পক্ষপাতী জানে, মনে করে, জীবনের যতখানি অপরাধ, শান্তি তাহাকে তাহার অপেক্ষা অনেকটা কমাইয়া দেখে। তাই প্রভাষের দুঃখের পরিমাণ সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। সে যে জীবনকে মার্জ্জনা করে নাই, ইহাই শান্তি মনে রাখিয়াছে। কত দুঃখে যে করিতে

পারে নাই, তাহা বুঝে নাই। তাই শান্তির কাছে আর হৃদয় খোলা হয় না। অভিমানে সঙ্কোচে দুজনে দূরে দূরে থাকে, কেহ কাহারও হৃদয়ের নাগাল পায় না।

কিন্তু প্রভাষেরই মনের আবেগ বাহিরে বাঁশীতে ছাড়া পায়, শান্তির ত কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, সব সময়ে তাহার নিঃসঙ্গ দুঃখ-বিলীন জীবনের কথা তাই মনেও হয় না। তাই আজ যখন প্রথম তার বীণার করুণ ঝঙ্কার প্রবল বায়ুপ্রবাহে প্রভাষের কানে ভাসিয়া আসিয়া শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার চিত্ত বড় চঞ্চল হইল। সুরের পরতে পরতে প্রভাষের মানসচক্ষে বড় বেদনা, বড় শূন্যতার স্তর একে একে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। এই তরুণ বয়সে এই দুঃখ ভারে অবনমিত ভূমিসাৎ হৃদয়ের সমস্ত কারুণ্যটা তাহার বক্ষে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে যত দুঃখ শান্তির না ছিল, তাহার অপেক্ষা বেশী দুঃখে তাহাকে দুঃখী

অনুমান করিল। ঘনীভূত দুঃখ তরলায়মান হইলেই হৃদয়ভার অশ্রু হইয়া গলিয়া আসে, আজিকার প্রকৃতির প্রভাবে শান্তির মনোভার কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছিল বলিয়াই সে বীণার নিকট অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু প্রভাসের উত্তেজিত কল্পনায় বোধ হইল, শান্তির বীণা-ধারণ তাহার দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। এই ম্লান চন্দ্র, এই প্রবল বাত্যা তারই মধ্যে নির্জন গৃহে শান্তির দীনা ছবি প্রভাসের হৃদয়কে বড় নাড়া দিল। শান্তির নিকটে গিয়া একটি স্নেহ-সম্ভাষণ, তাহার ললাটে একটি সস্নেহ হস্তস্পর্শের জন্য হৃদয় বড় লোলুপ হইল—কিন্তু কিছুই করা হইল না। চট্ করিয়া একটা চিন্তা মনে বাধিল—শান্তি যদি তাহাকে ঠিক না বোঝে? সে যে ভাবে আর্দ্র হইয়া তাহার নিকট যাইবে, তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু যদি শান্তি ধরিয়া লয়? যদি মনে করে, জীবনের অপরাধির ন্যূনতা সম্বন্ধে সে এখন শান্তির সহিত একমত? তাহা নয়, তাহা নয়,

জীবনের প্রতি সে কোমলতা দেখাইতে পারিবে না, জীবনকে সে মার্জ্জনা করিতে পারে না। তাই শান্তির নিকট যাওয়া হইল না, তাই আর তাহাকে দুট মিষ্ট কথা বলা হইল না।

তাহার পর এমন মাঝে মাঝে কোন কোন সন্ধ্যায় শান্তির সেতার বাজিতে লাগিল, প্রভাষের চিত্তও ক্রমেই বেশী অস্থির হইতে লাগিল, শান্তির প্রতি স্নেহ ব্যবহারের লালসায় হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু সে পীড়া শান্ত করিবার উপায় রুদ্ধ, দুজনের মধ্যে এমনি কঠিন সঙ্কোচের দেয়াল উঠিয়াছে। অবশেষে একদিন তাহার আবেগ আত্মশান্তির নূতন পথ খুঁজিয়া লইল। প্রভাষ কাগজ পড়িয়া নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের কাহিনী লিখিল, সহজ সুন্দর ভাষায় সমস্ত কারুণ্য ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল, ক্রমে ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিল। শান্তির বীণার তান কাণে আসিলেই সে যেন দশাপ্রাপ্ত

হইয়া কলম ধরিত। তার পরদিন সকাল বেলায় পড়িলে সেটা দাঁড়াইত একটা সুললিত মর্মহারী সাহিত্য-প্রসূন।

৫

শান্তি কখন প্রভাষের গৃহে আসে না। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রভাষ বাহিরে গিয়াছে; বহুকাল পরে শান্তির সে দিন তাহার গৃহে আসিতে সাধ হইল; সঙ্গীহীন, একক ভ্রাতার কি করিয়া সারাদিন কাটে, কত যে হৃদয় বেদনা গৃহতৈজসেরা তাহার যেন সাক্ষ্য দিবে, যে সকল অচেতন পদার্থ তাহার ভ্রাতাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে তাহাদের কাছে আসিয়া একবার তাহার জন্য অশ্রুপাত করিতে সে প্রভাষের গৃহে আসিল। বহুদিন পরে সুহাসিনীর নিদর্শন পূর্ণ সে গৃহ দেখিয়া শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, টেবিলের সম্মুখে চৌকির উপর উপবেশন করিল, টেবিলের উপর একখানা বাঙ্গালা কাগজ দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহা হাতে লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। হঠাৎ একটা লেখায় তাহার মনোযোগ

আবদ্ধ হইল, ক্রমে সে অবহিতচিত্তে উত্তেজিত মস্তিষ্কে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। প্রভাষ গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল শান্তির হাতে কি কাগজ এবং তাহার মধ্যে কোন্ রচনায় সে নিবিষ্টচিত্তা। সে কিছু বলিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তির পড়া শেষ হইলে উঠিয়া ক্লিষ্টমূর্ত্তিতে প্রভাষের দিকে চাহিয়া বলিল "দাদা একি তুমি আর আমি?" প্রভাষ বলিল "হ্যাঁ।" শান্তি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। নিজের গৃহে গিয়া একবার ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিল, তারপর উঠিয়া চোখ মুছিয়া গৃহ কাজে গেল। প্রভাষের সহিত সম্পর্ক আরও বিরল হইয়া আসিল, আর কখন তাহার গৃহে যায় না। প্রভাষের সঙ্গীতের ভাষা শান্তি বুঝে, চিরকাল তাহাতে অভ্যস্ত, কিন্তু আর কিছু শান্তির পক্ষে বিজাতীয়। তাহার লেখার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহা যে কতখানি দুঃখ, কতখানি সমবেদনার ফল তাহা বুঝিতে পারিল না। সে শুধু ভাবিল, 'দাদা

হৃদয়হীন, আত্মীয়জনের মর্ম্মভেদী দুঃখকে যশের পণ্য দ্রব্য করিয়াছেন। শান্তির প্রতি ব্যবহারে যে স্নেহের ত্রুটী হইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভাষ প্রতি-নিয়ত এই সাহিত্য তীর্থে করিতেছে তাহা শান্তি বুঝিল না, তাহার প্রতিকারেচ্ছার ব্যাকুলতা কিছু ধরিতে পারিল না।

তাহার পর হইতে শান্তির সেতার একেবারে স্তব্ধ হইল; সজীবতার শেষ ছিদ্রটুকু পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল। সে নূতন করিয়া হৃদয়ের চারি পাশে কঠিনতার প্রাচীর গাঁথিল। তখন প্রভাষের বাঁশী প্রতি রাত্রি বড় ক্রন্দন কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে প্রাচীর ভেদ করিয়া বহু বিলম্বে হততেজে শান্তির হৃদয়ে পৌছিত। আর তাহা শান্তিকে শীঘ্র উতলা করে না, আর শান্তি প্রভাষের ব্যথায় ব্যথিত হয় না। কিন্তু কতদিন এভাব টিকিবে! ক্রন্দনের আঘাতে আঘাতে প্রাচীর জীর্ণ হইয়া আসিল, অল্পে অল্পে বিলম্বে তাহা খসিল, একদিন শান্তির অনাবৃত

বক্ষে বাঁশী আবার বিঁধিল। এ সুহাসিনীর আবাহন নহে, প্রভাসের আত্মকরুণা নহে, এবার বাঁশী বার বার কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্তির নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ পায় নাই, শান্তি সব বুঝিল। আজ প্রভাসের লেখার মর্ম্মও সে বুঝিল, তাহা যে স্নেহ বিরহিত হৃদয়ের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্ক্ষার ভাষা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিল।

প্রভাষ ছাদের উপর একহাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, বাঁশী তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তাহার অন্য হাতটী নিজের হাতে লইয়া বলিল, "দাদা।"

প্রভাষ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল। "আমায় মাপ কর ভাই।"

অশ্রু বিজড়িত স্বরে প্রভাষ বলিয়া উঠিল,—"তুই আমায় মাপ কর শান্তি, তোর এত দুঃখেও আমি তোর

প্রতি কঠিন ছিলুম, আমি নিষ্ঠুর বড় নিষ্ঠুর—জীবনকে ক্ষমা করিনি, তার অন্তিম ভিক্ষা অবহেলা করেছি, হায়, কে পাপী, জীবন না আমি? ওহে জীবন, ভাই, একটিবার ফিরে এসো, এ হতভাগ্যকে তোমার শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাও।”

*　　*　　*　　*

তারপরে? তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, শুধু এই ক্লেশ তাপিত ধরণীর দুটি প্রাণীর জীবনভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আসিল।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা